তীর ও তরঙ্গ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

এই উপন্যাসের রচনাকাল —পৌষ-ফাল্গুন, ১৩

১২।১

প্রতি বারের মত এবারও তারা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল— যথাসময় সদলবলে নদীর পাড়ে গিয়া দাঁড়াইবে। আনি পদী খেস্তিও সঙ্গে যাইবে বলিয়া রাখিয়াছে। ও-বাড়ীর অনুদিও অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাকেও যেন ডাকিয়া লওয়া হয় যথাসময়। এক মাস ধরিয়া দাদা আসিবার এই দিনটি লইয়া কত গবেষণা : দাদা রুমাল দোলাইয়া আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিবেন চলন্ত ষ্টীমার হইতে, অমনি নীলু ও বাবলু ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী ছুটিবে—কে আগে মাকে এই শুভ সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবে !

ই আজ মাঠে মারা গেল। সূর্যিমামা শেষকালে আসিবার সময়টাতেই !

র করিয়া আবৃত্তি করে :

"মেঘরাণীর ভাঙা ঘর
বৃষ্টি পড়ে ঝর ঝর।"

কা ছেলে। ও ছড়া বলতে আছে বুঝি ? তাতে যে আরো

রর দিদির কথায় ছয় বছরের ছোট ভাই অপরাধীর মত ছড়া বলতে হয়, ছড়া বলিয়াছে। অতশত ...

া বলব দিদি ?"

নেবুপাতা করমচা
ওরে বৃষ্টি দূর যা।"

গড়্ গড়্ করিয়া মেঘ ডাকে। বৃষ্টি পড়ে ঝুপ্ ঝুপ্। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়া এবার দুটি ভাইবোন গাহিয়া চলিয়াছে ঃ

"নেবুপাতা করমচা
ওরে বৃষ্টি দূর যা।"

তবু বৃষ্টি থামে না। জলের শব্দে পদ্মার অমন আক্রোশও চাপা পড়িয়া গেল।

দূরে শোনা গেল—ফুঁ-উ-উ...

এ-যে চলিয়া যাইবার 'সিটি'। নীলু সোৎসাহে রান্নাঘরে মাকে ডাকিয়া কহিল, "মা, জাহাজ অনেক্ষণ এসে গেছে। শুনলে না ঐ ছেড়ে দেবার বাঁশি বাজল।"

রান্নাঘর থেকে মা শুধু জানান—হুঁ।

ঢাকা মেল কখন যে তারপাশা গেল আজ কেহ তাহা টের পায় নাই। ঐ আবার বাজে—ফুঁউ। কি আওয়াজে ছাড়ে, কোন আওয়াজে ভিড়ে, ঢাকা মেলেরই স্বর মোটা, না চিটাগাং মেলের, মাদারীপুর লাইনের সব কয়টি ষ্টিমারই মিহি গলায় কি-না—নীলু ও বাবলুর সে-সব কথা একেবারে ঠোঁটস্থ। কিন্তু বৃষ্টির যে [illegible] থামিবার কোন লক্ষণই নাই!

"দাদারা ভিজছে দিদি?"

"না রে। তাঁরা এখন নৌকায় উঠেছে।—ছই-এর মধ্যে কেমন ক'রে রে?"

"চক্কোত্তি বাড়ীর ঘাট থেকে যখন আমাদের বাড়ীতে তখন?"

"ঠাকুরদা ছাতা নিয়ে গেছে দেখিস্ নি ?"

"যাঃ—কখন নিলে ? আমি বুঝি তা হ'লে দেখতাম না ?"

"তুই তো তখন ইষ্টিসানে যাবার জন্যে কাঁদতে লেগেছিস।"

দিদির কথায় বিশ্বাস না হওয়ায় বাবলু ডাকিল, "মা ! ও মা !"

"কী ?"—রান্নাঘর হইতে মায়ের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

বাবলুকে বলিবার অবসর না দিয়া নীলু চীৎকার করিয়া কহিল, "হ্যাঁ মা, ঠাকুরদা ছাতা নিয়ে যান নি ?"

"হ্যাঁ।"

"ঐ শোন্, মাও বলছে," নীলু ভাইকে নিশ্চিন্ত করিতে চায়।

"আচ্ছা দিদি, বল্ তো এবার দাদা আমার জন্যে কী আনবে ?"

"সে কথা পরে হবে'খন।—ঐ ছাখ্ আবার জোরে বৃষ্টি আসে।"

আবার দু ভাইবোন ছড়া কাটে :

"নেবুপাতা করমচা
ওরে বৃষ্টি দূর যা।"

মিনিট পনের গর্জ্জিয়া বর্ষিয়া এখন থামি-থামি ভাব। নেবুপাতা ও করমচার জয় জয়কার। নীলু হাঁকিল, "মা, চেয়ে ছাখো বৃষ্টি ধরে গেছে।"

মা মন্দাকিনী দুয়ারের বাহিরে একবার মুখ বাড়াইয়া হাসিয়া কহিলেন, "এখনো ভালো করে থামে নি রে—তোরাও থামিস নি যেন।"

বাবলু থামে নাই। দিদিকে বাদ্ দিয়া সে একাই ছড়া কাটিয়া চলিয়াছে। দিদি আবার যোগ দিল ভাইয়ের সঙ্গে।

ঝিরঝির ইলশে গুঁড়ি। এক ঝলক রোদও উঠিয়াছে। উঠানের জল আঁকুবাঁকু হইয়া পুকুরে নামিতেছে।

এবার থামিয়াছে। গাছের পাতারা জল ঝাড়িয়া ফেলিল। নারিকেলের আগ-ডালে রোদ করে চিকচিক। খেয়ালী প্রকৃতি আবার হাসে। হাসে ভাই, হাসে বোন। রান্নাঘরে মায়ের মুখেও খুশীর হাসি।

দাদা আসিতেছেন; ছেলে আসিতেছে; আসিবে আজ নাতি। ব্রজনাথ রায়ের গোটা সংসার আজ উন্মন।

বারান্দায় বসিয়া আছে মা, মেয়ে আর ছোট ছেলে। হেঁসেলের আর সব কাজ সারিয়া মন্দাকিনী ভাতের হাঁড়িতে গলা অবধি জল দিয়া আসিয়াছেন। তিন জনের মিলিত দৃষ্টি দত্তদের আম বাগানের কোনে—অন্তরালের পথটা যেখানে মোড় ঘুরিতেই তাহাদের বাড়ী থেকে সটান চোখে পড়ে।

নীলু বলে, "এখনো যে আস্‌ছে না মা।—জাহাজ ছেড়ে গেছে, এক ঘণ্টা হয় নি?"

"কী জানি, এত সময় নেবার তো কথা নয়।—বৃষ্টির জন্যে বোধ হয় নৌকায় উঠতে দেরি করেছে।"

"দাদার এবার বিয়ে হবে, না মা?" বাবলু একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে।

আনমনা মাতার সে-কথায় কান নাই। ভাবিতেছেন আর এক ছেলেরই কথা।

"বলো না, মা!"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ," মন্দাকিনী শুধু চাহিয়া আছেন কখন ঐ পথের বাঁকে মুটের মাথায় হঠাৎ সেই আটাশ ইঞ্চির সুটকেসটা দেখা দিবে—আর পিছনেই পুত্র সুনীল।

বসিয়া আছে মা ও মেয়ে। বাবলু উঠিয়া চৌকির তলা থেকে বিড়ালের বাচ্চাটাকে লইয়া আসিল। এই অভ্যর্থনায় সে ও একজন সভ্য আজ। রোজ রোজ একটা বড় টিকটিকি ঢেউখেলানো টিনের পাটাতনে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে-ও আজ কি জানি কেন ঠিক এই সময়টাতেই চৌকাঠের উপরে আসিয়া থামিয়া আছে। বাকি ছিল শুধু বাঘা। সে প্রাত্যহিক প্রাতভ্র্মণে বাহির হইয়াছিল; এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ডজন খানিক স্বজাতির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়া, ঘরে ফিরিবার পথে এতক্ষণ শুধু বৃষ্টির জন্যই ধোপাবাড়ীর ঢেঁকিঘরে আটকাইয়া ছিল। সে-ও এখন দাওয়ার কোল ঘেঁষিয়া উঠানের কোনে শুইয়া পড়িয়া ঘন ঘন লেজ নাড়িতেছে। সংবর্দ্ধনার কোন ক্রুটী নাই। ব্যাপার তো আর সহজ নয়। পূজার ছুটিতে আজ বাড়ী আসিতেছে রায় পরিবারের মধ্যমণি।

"মা, ঐ দ্যাখো একটা কুটুমাই পাখী।" কাপড় শুকাইবার বাঁশের খুঁটিতে একটা পাখী উড়িয়া আসিয়া ডাকিতেছে—কুট্ কুটুম। কুটুমাই ডাকিলে সেদিন বাড়ীতে নাকি কুটুম আসে।

"দাদা বুঝি কুটুম, বোকারাম আমার।"

"হ্যাঁ, কুটুম। তুই জানিস্ না।" দিদির কথায় ছোট ভাই প্রতিবাদ জানায়।

নীলু যাকে সাক্ষী মানিবে এমন সময় অণিমা আসিয়া হাজির। অণিমাদের বাড়ী পুকুরের ওপারের বাঁশঝাড় পার হইলেই।—গ্রাম-সম্পর্কে আত্মীয় ওরা। উঠানে পা দিয়াই অণিমা কহিল, "এখনো আসে নি বড়মা?"

"না।—আয় মা। বস্ এখানে।"

অণিমা নীলুকে অনুযোগ করে, "আমায় তো খুব ডেকেছিল?"

"বা রে! নদীর পাড়ে আমরাই বুঝি গেছি! বিষ্টি থামবার আগেই না জাহাজ চলে গেল অনুদি!"

বেলা বেশ চড়িয়াছে। তবু শ্বশুর আসেন না। মন্দাকিনী আন্দাজ করিলেন, ছেলে নিশ্চয় আসে নাই, তাই বৃদ্ধ শ্বশুর পয়সা বাঁচাইবার জন্য অনেক ঘুরিয়া পায়ে হাঁটিয়া আসিতেছেন। এবার বর্ষা আসিয়াছে শেষের দিকে। মাঠে মাটে এখনো জল জেলাবোর্ডের বাঁধানো সড়ক হইয়া আসিলেও তো এত দেরি হইবার কথা নয়!...

ছেলে আসে নাই এমন কি দুর্ভাবনা? আজ সন্ধ্যায় চিটাগাঙ্ মেলেও তো আসিতে পারে। না হয়, কাল। নতুবা পরশু নিশ্চয়ই। তবু আজ তো আর কাল-পরশু নয়। অসহিষ্ণু মাতা ছোট ছেলেকে সহসা প্রশ্ন করিলেন, "খোকন, ঠিক করে বলো তো, দাদা তোমার আজ আসবে, না কাল আসবে?"

ছেলেপিলেদের মুখ হইতে হঠাৎ প্রশ্নের চটপট জবাবে নাকি খাঁটি

খবর পাওয়া যায়, এমন একটা সংস্কার আছে। বাবলু একটু ইতস্তত করিয়া উত্তর দেয়, "আজ আসবে।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যেও একটা টিকটিকি ডাকিল— টিক্‌-টিক-টিক্‌। "সত্য সত্য সত্য—তিন সত্য"—মন্দাকিনী ও অণিমা প্রায় একসঙ্গেই তুড়ি দিয়া অভাবিত সংঘটনে সায় দিল। মন্দাকিনী আবার কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় নীলু চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঠাকুরদা আসছে মা।"

ব্রজনাথ রায় বাড়ীর সীমানায় আসিয়া পড়িয়াছেন। একা। মন্থর-গতি। বগলে ছাতা। ডান হাতে একটা বড় ইলিশ মাছ। বাজার সারিয়াই ষ্টেসনে গিয়াছিলেন কিন্তু নাতি আসে নাই।

বাবলু দৌড়িয়া গেল ঠাকুরদার কাছে।

"দাদাকে নিয়ে এলে না কেন ?"

"আসে নি আজ।"

"হ্যাঁ এসেছে, তুমি ছাখো নি।"

ছাতা আর মাছটা বারান্দায় রাখিয়া ব্রজনাথ ছোট নাতিকে এক হাতে কোলে তুলিয়া লইলেন, "দাদা তোমার কালই আসবে দাদু।— বৌমা, আমার ডান হাতে একটু জল দাও।"

শ্বশুরের আঁশ হাতে জল দিয়া মন্দাকিনী প্রশ্ন করেন, "আজ এল না কেন বাবা ?"

জবাব দিল অণিমা, "অত ভাবছো কেন বড়মা ? কোনো কারণে হয় তো কাল রাত্রে রওয়ানা হতে পারে নি।"

অণিমার আশ্বাসে মাতা যে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই তাহা বেশ

বোঝা যায়। ব্রজনাথ এবার পুত্রবধূকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার চিঠিতে শুক্রবার রওয়ানা হবে বলেই তো লিখেছিল?"

"তাই তো লিখেছে।"

"অনুর কথাই ঠিক। কাল রওয়ানা হ'তে পারে নি।—পাড়ার ভুপেন এসেছে, তারিণী দাশের পরিবারও আজ এল।"

মন্দাকিনী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকার সঙ্গে ওদের দেখা হয় নি?"

"ভুপেন বললে, দিন দশেক আগে নাকি একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল।"

শ্বশুর ও পুত্রবধূর বাক্যালাপের মাঝখানে ভাই-বোন চুপ করিয়া চাহিয়া আছে নৈরাশ্যে। ঠাকুরদাদা যে একটা বড় ইলিশ আনিয়াছেন সেদিকে আজ কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। অন্য দিন হইলে এতক্ষণে বিতর্ক সুরু হইত, মাছটার ডিম হইয়াছে কি-না—হইলে, কত বড়, আজ কে ল্যাজা খাইবে, কে খাইবে কণ্ঠা। মাছটার দিকে আজ শুধু বিড়ালের বাচ্চাটাই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

কুমড়া-ঝাকায় আবার একটা কুটুমাই আসিয়া ডাকিল—ইষ্টি কুটুম। অণিমা পুকুর পাড়ে কুল-বাগানের দিকে একবার তাকায়। এ-বাড়ীতে আসিবার পথে খানিক আগেই না সে দেখিয়াছিল, কামারদের গরুটা বৃষ্টির জলে ভিজিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আর বাছুরটা মাতৃস্তন্য পান করিতেছে। অণিমার আসিবার সময় গো-প্রসূতি ছিল ডানদিকে—নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ। বাদলদা অর্থাৎ সুনীল যে আজ নিশ্চয় আসিবে সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না তার। বাদলদাকে অণিমা কতকাল দেখে নাই!—দীর্ঘ দশ বৎসর।…

উৎকণ্ঠিত মন্দাকিনী শ্বশুরকে কহিলেন, "কোনো অসুক-বিসুক হয় নি তো বাবা? আমার মনে যে —"

অণিমা বাধা দিয়া কহিল, "তোমার যত অলক্ষুণে কথা, বড়মা। কালই বাদলদা আসবেন, দেখে নিয়ো।"

"মা দুগ্‌গা ভালোয় ভালোয় খোকাকে আমার বাড়ী এনে দিন। মহাষ্টমীর দিন আমি পাঁচ সিকের চিনির ভোগ দেব।" বলিয়া মাতা হাতজোড় করিয়া দেবতার উদ্দেশে সন্তানের কুশল কামনা করিলেন।...

পুত্র সুনীল তখন কলিকাতায়।—আরপুলী লেনের মেসে। কলতলায় ঘটা করিয়া স্নান সারিয়া লইতেছে। আজ দুপুরে কুমারী নমিতা সেনের পরিবারকে, আসলে নমিতাকেই শিলং মেলে সী-অফ্ করিতে যাইবে।

দুই

পরদিন ঢাকা মেলে সুনীল বাড়ী আসিয়াছে

ঠাকুরদাদা পরদিনও মত যথাসময় ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। একদিনেই এত কাণ্ড! পিতামহের দুর্ভাবনা দূর হইল। মা-ও সুস্থির হইয়াছেন। ছোট ভাইবোনের উন্মুখ প্রতীক্ষা মিটিয়াছে। প্রবাসী ঘরের ছেলে ঘরে আসিয়াছে।

আজ আর 'এশিয়া কেমিক্যালে'র ষাট টাকা মাহিনার কেরাণী নয়। বকুলতলার ব্রজনাথ রায়ের পরলোকগত সন্তান সুধীর রায়ের পুত্র সুনীল রায়। গ্রামের চোখে সে তো আর যে-সে ছেলে নয়। এম-এ পাশ। রাজধানীতে থাকে। বড় চাকুরি করে।

পূজার ভিড়ে সুনীল কাল সারারাত গাড়িতে একটি বারও চোখ বুজিতে পারে নাই। দুপুরে ঘুমাইবে বলিয়া বিছানায় শুইয়াছে। মা তাঁর ছেলের মাথায় খানিকক্ষণ হাত বুলাইয়া গৃহকাজে বাহিরে চলিয়া গেলেন। সুনীল শুইয়াই আছে। একাই ভাল লাগে। বহুক্ষণ এক কাত হইয়া পড়িয়া আছে নিঃশব্দে। চোখে কিন্তু ঘুম নাই।

মনের চোখে বার বার দেখা দেয় শিয়ালদহ মেন-ষ্টেসন ৫ নং প্লাটফর্ম—বিদায়ক্ষণে নমিতা সেনের সেই দুষ্টু চোখের মিষ্টি হাসি !..

কুমারী নমিতা সেন!

বাহিরে ব্রজনাথ রায় ডাকিলেন, "বাদল! বৌমা, বাদল কোথায়?"

"এখন ওকে ডেকো না বাবা—কাল সারা রাত ঘুমুতে পারে নি।"

"মধুবাবু দেখা করতে এসেছেন। এই কাঁচা ঘুমে ডাকবো? থাক্, বিকেলে বাদলই না হয় ওদের পাড়ায় যাবে।" ব্রজনাথ বাহিরের ঘরে ফিরিয়া যান।

সুনীল শুনিল সবই। উঠিবার ইচ্ছা নাই...মিষ্টি করিয়া ভাবিতেছে, ধূপছায়া রঙের শাড়ির উপর নমিতার গোখ্‌রো বেণীর লাল টক্‌টকে রেশমী ফিতা।...তার ডান কপালে ভ্রুর ঠিক উপরেই ছোটবেলাকার সামান্য একটু কাটার দাগ। বড় সুন্দর সেই খুঁতটুকুও।...গাড়ি প্লাটফর্ম ছাড়িল এই মাত্র। জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া আছে নমিতা,—অবশ্য তার দাদা আর বৌদিও।...

ঢেঁকি-ঘরের ওদিকে মা কার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। কুকুরটাকে কে যেন 'আতু-তু' করিয়া ডাকিতেছে। 'চৈ-চৈ' বলিয়া পুকুরের হাঁসগুলিকে পাড়ের কাছে ডাকে বুঝি ও-বাড়ীর ময়না, না তার ছোট বোনটা? কাঁসারী-পাড়ার ধাতব আর্ত্তনাদ কানে আসিয়া লাগে। এই সব ছাড়া-ছাড়া শব্দসমষ্টির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সারাক্ষণ দূরেই পদ্মার একঘেয়ে আস্ফালন।...সুনীল শুনিতেছে সব কিছুই,

কাঁদিতেছে আর। কাল সারাদিন সারারাত, আজ এখনও—বেলা বাজে তিনটা; তবু নমিতা সেনের বিদায় বেলার ছোট্ট নমস্কারটি কিছুতেই যেন শেষ হইতে চায় না। বলে নাই তো কিছুই। সুনীলকে তার বলিবার কি-ই বা আছে। সুনীল তার গৃহ-শিক্ষক। সপ্তাহে চারদিন সন্ধ্যার পর ইংরেজী ও ইকনমিক্স পড়াইয়া আসে। দুই মাসের পরিচয়ে পড়াশুনার মাঝে মাঝে স্বল্প অবসরের সুযোগে সুবিধায় এমন কোন ঘটনা অবশ্য ঘটে নাই যাহাতে পঁচিশ বছরের অমন বুদ্ধিমান ছেলে সুনীলের পক্ষে একটা ধোকা হওয়াও উচিত। তবু, এই দু'মাসেই, অন্তত সুনীল তা-ই মনে করে, দু'জনের মধ্যে এমন-কিছু-তেমন-নয় ধরণেরই দু'চারিটি তুচ্ছ ব্যাপার হইয়া গেছে যাহাতে নমিতার মনের আসল কথাটি সম্বন্ধে সুনীলের মনে সন্দেহের অবকাশ আছে যদিও বা, কল্পনার অভাব নাই এক তিল। তার এত সব সম্ভব-অসম্ভবের ভুল যদি একদিন ভাঙ্গেই, ভাঙ্গুক না! সে-জন্য সুনীল অপ্রস্তুত নয়। সে বেশ জানে, এ তার আসল বসন্ত নয়—জল বসন্ত; রোগ সারিয়া গেলে দাগও মিলাইয়া যাইবে। তবু—

তবু ঐ কালো মেয়েটিকে তার এত ভালোও লাগে! নমিতা সেন কালো। বেশ একটু কালো। তবু সে কুশ্রী কালো নয়। মোলায়েম ময়লা—কেমন যেন নিরীহ গোছের রঙ। তার সান্নিধ্যে আসিলে টের পাওয়া যায় কালো পাথরের মতই এক স্পর্শ-নিরপেক্ষ সুন্দর শীতলতা। এক কথায়, নমিতা সেন অরূপসী যদিও বা, কুরূপা নয় কিছুতেই। কি উল্লাস তার চলায়, কি উচ্ছ্বাস তার বলায়, কি মাধুর্য্য তার লম্বা ছিপছিপে দেহের প্রতিটি রেখায়!

সুনীল উঠিয়া বসে। খালি খালি আর কতক্ষণ শুইয়া থাকা যায়।
ফিরে আসিতেই মন্দাকিনী সুধাইলেন, "খোকা, উঠেছিস!"

পঁচিশ বছরের ছেলে আজও মায়ের কাছে সেই 'খোকা'ই আছে।

"অনু এসেছিল রে—তোর সঙ্গে দেখা করতে।"

"কখন? আমি ত টের পাইনি।"

"তুই ঘুমুচ্ছিলি ব'লে ডাকি নি—তুই আস্‌বি বলে কালও তোর তিন-আনীর ন'কাকীমা আর অনু এসে দুবার করে ফিরে গেছে। তোকে ও কতকাল দেখে নি।"

"চিঠিতে একবার লিখলে, অনুরা সব দেশে এসেছে—ওর বাবার চাকুরি নেই। ব্যস! তারপর আর কোন খবর দিলে না। ওদের আজকাল চলে কেমন করে?"

"অনুর বাবা পলাশপুরের কুণ্ডুদের বাড়ী থেকে ছেলে পড়িয়ে সাত টাকা পায়। আর সুলতা ওদের দক্ষিণের ভিটের ঘরে এক ইস্কুল খুলেছে—আমাদের পাড়ার মেয়েরা পড়ে। মাসে দু' সের করে চাল দেয় প্রত্যেকে—ওতেই কোন রকমে চলে যায়।"

"ন'কাকা এদ্দিন চাকুরি ক'রে কি কিছুই জমাতে পারেন নি?"

"পারলে আর এ দুর্দ্দশা হবে কেন!—শুন্‌বি সব পরে। মেয়েটাকে দেখলে বড় দুখ্‌খু হয়।—তুই একবার ওদের বাড়ী যা। আমি অনুকে বলে দিয়েছি, ঘুম থেকে উঠে খোকাই দেখা করতে যাবে'খন।"

"না মা, আজ আর কোথাও বেরুচ্ছি নে—কাল যাব।"

সুনীল বাইরের ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, মন্দাকিনী কহিলেন, "তোর

২

ন'কাকীমা কী মনে করবে—আজ এক মাস ধরে তুই আসবি-আসবি করে ওরা। আজই একবার যাস্ লক্ষ্মীটি।"

"আচ্ছা, সন্ধ্যাবেলায় ঘুরে আসব—এখন নয়।"

"বাড়ী এসেই বরাবর তুই তক্ষুণি সারা গ্রাম ঘুরে সবার সঙ্গে দেখা করে আসিস।—এবার না গেলে সবাই কী মনে করবে বল্ তো?"

"যাব তো বললাম—কাল সকালে গেলেও তো হবে। সারারাত জেগেছি।"

পশ্চিমের ভিটার দো-চালা ঘরখানিই বৈঠকখানা। বারান্দায় বেতের চেয়ারটা টানিয়া আনিয়া পদ্মার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া পড়িল সুনীল। তাদের বাড়ী থেকে নদী এখন খুবই কাছে। সব স্পষ্ট দেখা যায়। দুর্ব্বার দুর্দ্ধর্ষ পদ্মা! সাম্‌নের ঐ ছোট মাঠটুকুর পরেই ছিল যদু কামারের বাড়ী। গেল বারও সুনীল তাদের চার ভিটায় চারখানি করোগেট-টিনের চৌচালা ঘর দেখিয়া গিয়াছে। এবার তার কোন চিহ্ন নাই। রাক্ষসী!...

শঙ্কিত দৃষ্টি দিয়া পদ্মার অশ্রান্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ ও তরল তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিতে দেখিতে আর শুনিতে শুনিতে মনে আসিয়া দাঁড়ায় আবার কুমারী নমিতা সেন। মনে পড়ে, সুনীল যেদিন নমিতাকে পড়াইতে গেল সেই প্রথম দিনটি। বড়লোকের বাড়ী। যথাসময়ের অনেক আগেই বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় নামিবার মুখেই রুমমেট্ ভবানী হাত নাড়িয়া গাহিয়া দিল—"জয় যাত্রায় যায় গো..."

বাহিরে আষাঢ়ের টিপ টিপ্ বৃষ্টি। কলেজ ষ্ট্রীট থেকে বালীগঞ্জ প্লেস্ অবধি সুনীল লংক্লথের ইস্তির ভাঁজ অতি যত্নে বজায় রাখিয়া আসিয়াছে।

চশমার কাচ মুছিয়া লইয়াছে বার পাঁচেক। মনে মনে কত শংকা, কত আশা। শেষকালে—...হা হতোহস্মি! এই তার ছাত্রী! কাঠলাও তো দেখিতে ভালো না হয় এমন নয়। এ যে একেবারে খড়কেকাঠিনী! তায়, বেয়াড়া রকমের লম্বা। ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়েই যেন চেয়ারটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পরিচয় হইয়াছিল ওদের বাহিরের ঘরে। সন্ধ্যা আসন্ন. ওর দাদা সৌমেনের কাছ থেকে ছাত্রী আর মাষ্টার চলিল উপরে পড়ার ঘরে। সিঁড়ির আলোটা জ্বালানোই ছিল। উপরে উঠিতেছে নমিতা। পিছনে নূতন মাষ্টার। তিন ধাপ নীচু থেকে অবাধ আলোর সুযোগে সুনীল এবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল তার নূতন ছাত্রীর আপাদ-শির।...না, আর যা-ই থাকুক্ বা না থাকুক্, বিধাতা চুলের দিকে কোন কার্পণ্য করেন নি। ডান হাতে সরু ক'গাছি চুড়ি। কানের দুল জোড়া প্রতি পাদক্ষেপে কথা কয় যেন। চমৎকার! তবু —কি বিশ্রী রোগা! অবশ্য, খাশা ঐ সিঁড়ির পথে উপরে ওঠার ভঙ্গিটি। আর নিখুঁৎ ঐ আলতা-না-পরা পা-দুখানির সশব্দ ছন্দটুকু। সুনীলের প্রথম পরিচয়ের হতাশ মেঘভার কতকটা হাল্‌কা হইয়া আসিয়াছে যা হোক্।...

রাত নটায় সুনীল ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিল—অবশেষে, আর কিছু না-ই বা থাকুক, চোখদুটি তার মন্দ নয়। মন্দ নয় কি! চোখ দুটি তার ভালোই বলিতে হইবে। ঐ ভাসাভাসা ডাগর দুটি চোখ। বাঙ্গালী মেয়ের সকল রূপ যে ঐখানেই।...

মেসে ঢুকিতেই মহাবিপদ। বন্ধুর দল ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ম-স্বরে একই দাবী—প্রথম দিনের ইতিহাস শোনাও।

"আঃ ছাড় না। অসভ্য!—বলছি সব। আমার ঘরে চল"

সুনীলের পিছনে চলিল লোভাতুর বন্ধুবাহিনীটি।

"বলো, কী জানতে চাও?"—সুনীল মুচকি হাসে।

পাঁচু বলিল, "আগে কথা দাও, কোনো কথা লুকোবে না—হলফ পড়ো, I shall speak the truth, only the truth and nothing but the truth."

"জানবে কেমন করে?"

জবাব দিল মন্মথ, "If looks speak mind's laws, you shall be hanged."

সুনীল হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, "তোরা কী যে সব ভাবিস্! আমি কি সেখানে প্রেম করতে গেছি?—প্রাইভেট টিউটর বুঝি নভেলের নায়ক? এক ভদ্রঘরের বাঙ্গালী মেয়ে প্রথম দিনের পরিচয়ে—"

সবাই প্রায় একসঙ্গেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "সে-টি হচ্ছে না—ও কথায় ভুলব না।"

এবার সুনীল স্থির হইয়া বসিয়া লয়, "বেশ! তোমাদের খুশি রাখতে করতে পারি সব কিছুই, মানে বানিয়ে বাড়িয়েও বলতে পারি অনেক কথাই। কী জানতে চাও? প্রশ্ন করো, এক এক ক'রে।"

"অল রাইট।—আগে বলো, ছাত্রীর বয়েস কতো?"

"কুড়ির ওপারে, বুড়ি হতে চলেছে।"

"তা—যাক্, দেখতে কেমন?"

"দেখতে?" সুনীল অকারণেই একটু কাশিয়া লইল, "দেখতে সে

horribly কালো, আর lamentably রোগা—প্রেমে পড়তেও করুণা জাগে।"

"ঘাবড়াও মাৎ। Beauty is lover's gift. তারপর?"

"এর পরেও আর কী থাকতে পারে?"

"তবু, আরো কিছু।"

"তবে শোন:—চোখ দুটি অবশ্যি খাসা।"

সকলে সমস্বরে—"এরে-রে!—তারপর?"

"মুগ্ধ তাহার তরুণ তনুর সঙ্গীতে।" সুনীল এবার আবৃত্তির সুরে বলিয়া যায়।

"বহুৎ আচ্ছা।"

"দেখেছি তাহারে সিঁড়িতে ওঠার ভঙ্গিতে।"

"Then?"

"নাকে-মুখে-চোখে সুর-শৃঙ্গার ঝংকৃত।"

"তারপর?"

"তারপর, তোমরা এক একটা ইডিয়ট।—ভুলে যাচ্ছ, বাংলা দেশটা মার্কিন মুলুক নয়"—সুনীলের রঙীন সূত্র ছিঁড়িয়া দিয়া মা মন্দাকিনী ডাকিলেন, "খোকা, কিছু খাবি এখন? দুধ গরম ক'রে দিই।"

"না মা, খিদে পায় নি।"

"একটুখানি খা। ক'লকাতায় তো আর দুধের মুখ দেখতে পাস না," বলিতে বলিতে মা আসিয়া ছেলের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়ান।

"চুপ করে বসে ভাবছিস কী এত?"

"এমনি

"তোর শরীর ভালো লাগছে না ?"

"না-গো, এমনি বসে বসে নদীর দিকে চেয়ে আছি।—তুমি দুধ নিয়ে এসো—খুব অল্প।"

মন্দাকিনী রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। সুনীল আবার তাকায় উত্তাল পদ্মার দিকে। এপারের কূলে ভাঙ্গন লাগিয়াছে। ধূ ধূ করে ওপার। মাঝখানে রাত্তদিন শুধু শোঁ-ও-ও শোঁ-ও-ও···

সুনীলের কাছে নমিতা পদ্মাপাড়ের কত কথাই শুনিয়াছে। তার বড় ইচ্ছা, একবার পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরিয়া যাইবে। মাষ্টার মশায়ের মুখে ঐ সর্ব্বনাশা নদীর কূলে কূলে একটানা একঘেয়ে শ্যামলশ্রীর কাব্যিক বিবরণ শুনিয়া শুনিয়া বাঙ্গাল-দেশটাকে সে নাকি বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।...

"দুধ অল্প করেই এনেছি—"

সুনীল চমক ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া তাকায়। মা'র হাতে দুধের বাটি :

"খোকা, তোর কি কোন অসুখ করেছে ?"

সুনীল এবার একটু রাগতভাবেই বলিয়া ওঠে, "না গো না! —আচ্ছা বিপদ! তোমাদের জন্যে একটু চুপ ক'রে বসে থেকে ভাবাও চলবে না!" কথাটা বলিয়াই সুনীল নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়। বৎসরান্তে বাড়ী আসিয়া প্রথম দিনই মায়ের সঙ্গে বাক্যালাপের এই বুঝি ধরণ! চাহিয়া দেখে, মায়ের মুখের উপর দিয়া অভিমানের একখানি চকিত ছায়া মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল।

মন্দাকিনী উঠিয়া গেলেন নিঃশব্দে। দুধের বাটি হইতে ধোঁয়া

উঠিতেছে। সুনীল চুপ করিয়া চাহিয়া আছে। মার আঘাতটা সে ভাল করিয়াই বুঝিতে পারে। সে যে তার মায়ের কতখানি এ-কথা সে বেশ জানে। কিন্তু...মা কেন ছাই বোঝে না—আর তো একচেটে দাবী নাই। শিশু যে আজ বড় হইয়াছে!...

অদূরে ঐ পদ্মার তীরে তীরে ভাঙ্গন লাগিয়েছে! তবু ঐ সংহার মূর্ত্তির উপর অপরাহ্নের ছায়াখানি যেন মাতৃস্নেহের মতই ছড়াইয়া পড়িতেছে।

খানিক বাদে সুনীল মা'র খোঁজে উঠিয়া পড়ে। বড় ঘরে দেখে, মা বিছানার উপর বসিয়া বালিশে অড় পরাইতেছেন। "ম

"বল্!"

"তুমি রাগ করেছ?" সুনীল শিশুর মত মায়ের কোলে মাথা শুইয়া পড়িল।

—"তুই যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছিস্ খোকা, এসে অবাধ তোর মুখ ভার। তোর কী হয়েছে সে কি মা হয়ে আমি করতেও পারিনে?"

"খুব পারো মা," বলিয়া সুনীল মাকে দু'হাতে জড়াই মন্দাকিনীও ছেলের মাথাটা বুকের কাছে লইয়া আ অবস্থায় হাসিতে থাকেন—গর্ব্বের হাসি, তৃপ্তির হা মেজাজটা ঠিক বাপেরই মত—হঠাৎ কেমন রুখিয়া ওঠে পরক্ষণেই নরম হয় চতুর্গুণ। বাপেরই ত ছেলে! মন্দাকি নিষ্পলক চাহিয়া থাকেন। ঘাড়টা আর একটু খাটো হইলেই তাঁরই মত। মুখের আদল তো তাঁরই পাইয়াছে, সবাই বলে

"মা!"

"কী?"

"কথা কও।"

এই সুযোগে মা তার বড় সাধের কথাটি পাড়িলেন, "খোকা, এবার কিন্তু আমি কোন আপত্তি শুনব না।"

সুনীল একটু হাসে। কথাটা যে কি তা সে জানে।

"হাসি নয়। আমি তাদের কথা দিয়েছি।—বড় ভাল মেয়ে, তোর …মার চেয়েও দেখতে ফর্শা। পূজোর পরেই তুই মেয়েটিকে একবার দেখে আসবি কিন্তু।"

অসহায় শিশুর মত সুনীল মায়ের বুকে চুপ করিয়া আছে।

মন্দাকিনী হাসিয়া কহিলেন, "চুপ ক'রে থাকলে চলবে না। জবাব দিতে হবে।"

"ফর্শা মেয়ে আমি বিয়ে করব না মা। বিয়ে করি তো তোমারই মতো এক কালো মেয়ে।"

"তা বই কি! তোমায় আমি কালো মেয়ে বিয়ে করাব কি-না?"

"ফর্শা হলেই বুঝি দেখতে ভালো?"

"না রে না, মেয়েটি দেখতে ভা-রী সুন্দর।—বয়সেও কম নয়, সতের—তোদের আজকালকার পছন্দসই।"

সুনীল মৃদু হাসিয়া রহস্য করে, "হুঁ।"

"হুঁ কি! কালো বউ আমি ঘরে আনছি যেন! আমি কালো বলে তোর ঠাকুরদা'র মনে দুখ্খু ছিল। ভাগ্যিস তোরা কেউ আমার রঙ পাসনি। তোদের ঘরে কেউ কালো নয়। তোর ঠাকুরদা ফর্শা, তোর বাবা

ছিলেন ফর্শা। পিসিমাকে মনে পড়ে ? দুধে-আলতা রঙ ছিল তাঁর

মা কথা বলিয়া চলিয়াছেন অনর্গল ! পুত্র কতক শুনিয়া ক
ন-শুনিয়া চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া আছে।—একদিন ছিল, আজও
কিছু মনে পড়ে, যেদিন মাকে ছাড়িয়া সুনীল একরাত্রি অন্যত্র
কাটাইতে পারিত না। তারও আগেকার ইতিহাস—একে
শিশু-অবস্থার কথা—সে কি আর কাহারও মনে পড়ে! সেদিনের
জোড়া শিশু ক্রমে ক্রমে হাঁটিতে শিখিল, কথা বলিতে শিখিল, নি
নিজের হাতে নাহিতে খাইতে কাপড় পরিতে—তারপর এক
খেলার মাঠ, তাসের আড্ডা, যাত্রার আসর ; পাঠশালা হইতে স্কুল,
হইতে কলেজ ; অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া চাকুরি ! আজ কত নানা
চিন্তা, নানা মত, নানা পথ : দেশ-বিদেশের অতীত ও বর্ত
জীবনের বড় বড় সমস্যা। চঞ্চল শিশু একদিন অশ্রান্ত হাত-পা
য়াছে মায়ের কোলে, সেই লক্ষ্যহীন গতি-প্রাচুর্য্য এখন সুসংযত, ক
অথচ কত জটিল, কত না গভীর—স্পষ্ট ও অস্পষ্ট,অর্থ ও অনর্থের কি
বেদনা তার মনে—কি সুন্দর সংঘাত। মা-ছেলের একটানা আবে
মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সারা দুনিয়া। এই না নিয়ম! এই
রীতি।—ঝুপ করিয়া খানিক পাড় বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িল। নদীর
হইতে স্থিতি ও গতির যেন চির-বিরোধের শব্দ ভাসিয়া আসে।···

"কথার জবাব দিচ্ছিস না যে ?"

"হ্যাঁ।"

"ওঃ! তা হ'লে আমার কথায় এতক্ষণ তোর কান ছিল না"

সুনীল হাসিয়া উঠিল, "বিয়ে আমি করব না মা।"

"কেন ?"

"শুনতে পাচ্ছনা ঐ শোঁ শোঁ শব্দ ?—পদ্মা ভাঙ্গছে।"

মন্দাকিনী হাসিয়া উঠিলেন, "ছেলের কথা শোন ! পদ্মা ভাঙছে তো তাতে বিয়ের কি ?"

"তুমি কি ক্ষেপেছ মা ?—গেলবার কামারবাড়ীর চার ভিটেয় চারখানা ঘর দেখে গেছি ; এবার তার কোন চিহ্ন নেই। তোমাদের নিয়ে যাব কোথায় ? কলকাতা ছাড়া তো আর কোথাও ঠাঁই নেই। আমার এ সামান্য আয়ে আমরাই আগে খেয়ে বাঁচি, তারপর বিয়ের—"

"রাখ্। অত-শত ভাবলে দুনিয়ার কেউ কোন দিন বিয়ে করতে পারত না। এ তোর একটা ছুঁতো।"

পাশাপাশি শুইয়া আছে মা আর ছেলে। মন্দাকিনী পুত্রকে এত কাছে বহুকাল পান নাই—এমন করিয়া কোলের কাছে। খানিক আগের অপরিচিত পুত্র তার শৈশবের আত্মভোলা আবেগ লইয়া আবার ধরা দিয়াছে : আজ তার কত কথাই না এক নিমিষে এক সঙ্গে মনে পড়িতে চায় ! সুনীল তার প্রথম সন্তান।—তার বড় আদরের 'খোকা'।

মন্দাকিণী থাকিয়া থাকিয়া ছেলের গায় মাথায় হাত বুলান।

"মা, আমায় তুমি সত্যি বিয়ে দিতে চাও ?"

"হুঁ"

"কেন ?"

"ছেলের কথা শোন !"

"আমি মা হ'লে কিন্তু ছেলেকে আমার বিয়ে দিতুম না।"

"কেন ?"

"বিয়ের পর, লোকে বলে, ছেলে নাকি পর হয়ে যায়!—পর না হোক্ অনেকখানি দূরে সরে যায় এ-কথা কি মিথ্যে মা ?"

মন্দাকিনী উত্তর দিতে গিয়া দুয়ারের দিকে চোখ পড়িতেই থামিয়া গিয়া ডাকিলেন, "অনু এসেছিস্ ? আয় মা, আয়। লজ্জা পাচ্ছিস কাকে দেখে ?—এক মাস ধরে যে 'বাদলদা কবে আসবে, কবে আসবে' করে অস্থির হয়ে উঠেছিলি রে ! আয় না ইদিকে।"

সুনীল চট্ করিয়া উঠিয়া বসে। অণিমা কাছে আসিয়া তার পায়ের ধূলা লয়। লজ্জাটা কেবল অণিমারই নয়, হঠাৎ তাকে সম্বোধন করিতে বেশ একটু সঙ্কোচ বোধ হয় সুনীলেরও। অণিমাকে সে ছোট বেলায় দেখিয়াছে। সেই—সেবার যখন রাজাবাড়ীর মঠ কীর্ত্তিনাশার জলে ডুবিয়া গেল, সেই বৎসর অনুর বাবা সপরিবার কর্ম্মস্থলে চ'লয়া গেলেন। তারপর আজ দশ-এগার বৎসর পরে দেখা! সে দিনের ছোট্ট অনু যে এখন দস্তুরমত কুমারী অণিমা দেবী! কথা বলিতে রীতিমত ভয় লাগে।

সুনীল মৃদু হাসিয়া কহিল, "অনু, তুই এত বড় হয়ে গেছিস ?"

লজ্জাভারে অণিমার চোখের পাতা নামিয়া পড়ে। কথা বলিলেন মন্দাকিনী, "দাঁড়িয়ে আছিস কেন মা ?—বস্ না এখানে।"

সুনীল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ও আমায় দেখে লজ্জা পাচ্ছে মা।—আরে, এই সেদিনও তো তোকে ফ্রক্ পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি রে।"

অণিমা চৌকির উপর মন্দাকিনীর পাশে গিয়া বসিতেই সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "ন'কাকা আর কাকীমা ভাল আছেন তো?"

অণিমা মাথা না তুলিয়াই ঘাড় নাড়িল—"হুঁ"।

লজ্জা পাইবারই কথা। সুনীলকে সেই কবে দেখিয়াছে! মনে আছে, সেবার আষাঢ়ের প্রথমেই অকাল বর্ষা। চারদিকে জল করে থৈ থৈ। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে—ভাল পাশ করিয়াছেন সুনীলদা। সেই ছিপছিপে সুনীলদা আজ লম্বা-চওড়া এক বলিষ্ঠ পুরুষ।

অণিমার মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকায় সুনীল। সেদিনের অণিমার কতটুকু আছে বা কতটুকু নাই একবার তাহা মিলাইয়া বুঝিতে চায়। বাহিরে গোধূলির ছায়া পড়িয়াছে! আবছা আলোয় সলজ্জ মুখের অস্পষ্ট মাধুর্য্যটুকু ছাড়া বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না। একটা কথাই স্পষ্ট হয় শুধু।—অণিমার ফুটিবার পালা সাঙ্গ হইয়াছে। আজ সে কানায় কানায় ভরা।

"অনু, আমি খানিক বাদেই তোদের ওখানে যেতাম। ন'কাকীমাকে কতদিন দেখি নি।"

অনুযোগের সুযোগ পাইয়া অণিমার লজ্জা অনেকটা কাটিবার পথ পায়। কহিল, "হ্যাঁ। সকাল থেকে সন্ধ্যের মধ্যে আপনার সময় হ'য়ে ওঠে নি।—আমাদের বাড়িটা পাঁচ শ' মাইল দূরে কি-না!"

"খুব যে কথা শিখে গেছিস!"

মন্দাকিনী হাসিয়া কহিলেন, "শিখবে না? ও কি আর ছোটটি রয়েছে।" তারপর অণিমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তুই তো আমার মলিনারও ছ'মাসের বড় লো।"

বয়সের উল্লেখ উঠিতেই অণিমা আবার চোখ নামায়। কিন্তু এবার আর মুখে কথা বন্ধ হয় না। সুনীলকে লক্ষ্য করিয়া মন্দাকিনীকে কহিল, "মা-ছেলেতে আলাপ চলছিল তো বেশ!—বড়মা, বাদলদাকে তুমি এখনো সেই খোকা ক'রেই রেখেছ।"

মন্দাকিনী হাসিয়া উঠিলেন, "ও কী বলছিল শুনবি অনু? ছেলের বিয়ে দিলে নাকি সে পর হয়ে যায়। ও তাই বিয়ে করবে না।"

সুনীল বাধা দিল, "ও সব কথা থাক্ এখন!—অনু, ন'কাকা বাড়ী আছেন?"

মন্দাকিণী তেমনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আবার বলে—দেখে শুনে এক কালো মেয়ে বিয়ে করব। আমার মা কালো, ফর্শা মেয়ে ঘরে আনব না।"

"সত্যি বাদলদা, এবার কিন্তু আপনাকে বিয়ে করতেই হবে।" অণিমার কণ্ঠস্বর এতক্ষণে অনেকখানি পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। সুনীল রসিকতা করিয়া জবাব দেয় "মেয়ে কোথায়?"

"তা বটে! দুনিয়ার বাদ বাকি আর সবাই পুরুষ।"

"সেই ছিঁচ-কাঁদুনে অনুও দেখছি কথা বলতে শিখেছে!"

"আমি ছিঁচ-কাঁদুনে, আর আপনি ভারী ই—য়ে ছিলেন, না?—কাউকে না ব'লে উমেদপুর হাটে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলেন, মনে আছে? পরদিন সকালে জ্যাঠামশাইয়ের মারের ভয়ে আমাদের বড়ঘরের চৌকির তলায় সারা দুপুর লুকিয়ে ছিলেন—এদিকে বাড়িতে হৈ চৈ কান্নাকাটি। মা বাসন আনতে গিয়ে ছ্যাখে—আমাদের বড় ঘরের চৌকির নীচে আপনি —বড় একবাটি নতুন গুড়ের পায়েস ছিল ঢাকা, আপনি চেঁচে মুছে

সব ”—অণিমা হাসির আবেগে কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না।

“গ্যাখ অনু, মিথ্যে কথা বলিস্ নি।”

“আমি ত মিথ্যে কথাই বলছি—আচ্ছা, বড়মাই সাক্ষী।—হ্যাঁ বড়মা, তারপর ও-বাড়ীর ঠান্‌পিশিমা জ্যাঠামশাইকে অনেক ক’রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাদলদাকে চুপি চুপি রান্নাঘরে তোমার কাছে রেখে যান নি? ঠিক বলো।”

মন্দাকিনী হাসি চাপিয়া কহিলেন, “কী জানি রে। অত শত মনেও থাকে না।”

“বা-রে। এই না তুমি পরশু বিকেলেই আমার কাছে গল্প করছিলে?”

তিন জনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল একসঙ্গে। হাসি থামিলে অণিমা অভিমানের ভান করিয়া কহিল, “বড়মা, তুমি ছেলের কোল টেনে কথা কইছ!”

মন্দাকিনী হাসিয়া ছেলেকে কহিলেন, “সন্ধ্যে হয়ে এল রে। খোকা, তুই এবার ন’কাকীমাদের সঙ্গে আর তোর চকোত্তি বাড়ীর পিশেমশাইর সঙ্গে দেখা সেরে আয় গে—বেশী রাত করিস্ নি যেন।”

সুনীল বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। মাতৃ আজ্ঞায় এবার সারা গ্রাম ঘুরিয়া আসিতেও সে রাজী আছে, অবশ্য সর্ব্ব প্রথমে ন’কাকাদের বাড়ীটা।

জামা পরিতে পরিতে অণিমাকে কহিল, “চল অনু, আগে তোদের বাড়িই যাব।”

এই অভাবিত প্রস্তাবে অণিমাই মহাবিপদে পড়িল। এই ভর সন্ধ্যা-

বেলায় বাদলার সঙ্গে এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী যাওয়াটা যে আজ একেবারেই অসম্ভব সেই এতটুকু কাণ্ডজ্ঞানও নাই অত বড় ছেলের!

সুনীলের ব্যগ্র আহ্বানে অপ্রতিভ অণিমা চোখ ফিরাইল মন্দাকিনীর দিকে সলজ্জ ভরসায়। দু'জনের চোখে চোখে কি কথার যেন অর্থ বিনিময় হইল মুহূর্ত্ত মধ্যে। মন্দাকিনী মনে মনে হাসিলেন, তার পঁচিশ বছরের ছেলে যেন আজও সেই পাঁচ বছরেরই অবুঝ খোকা! বিব্রত অণিমার লজ্জা বাঁচাইয়া দিয়া মুচকি হাসিয়া পুত্রকে কহিলেন, "তুই যা না। অনু একটু বাদেই যাবে। ওকে দিয়ে আমার একটা কাজ আছে এখন।"

বাহিরে আসিয়া মনে মনে হাসিল সুনীল।...সত্যই তো! তার সঙ্গে কি আর আসা চলে! অণিমা কি আর সে-অনু আছে! এখন সে নিয়মমাফিক শ্রীমতী অণিমা সরকার। সারা অঙ্গে তার প্রগাঢ় যৌবন। মুখেচোখে আজ অগাধ অর্থ!

তিন

অণিমাদের বাড়ী দূরে নয়। সুনীলদের পুকুরের পূব-দক্ষিণ কোনের বাঁশ-ঝাড়ের পাশেই। দিনের বেলায় এ-বাড়ী হইতে গলা ছাড়িয়া ডাকিলে ও-বাড়ীতে স্পষ্ট শোনা যায়।

কলা-বাগানের কাছ ঘেঁষিয়া ছোট কাঁচা রাস্তা। এখানে-ওখানে সামান্য কাদা, ছোট ছোট গর্ত্ত মাঝে মাঝে—ডিঙাইয়া যাওয়া চলে। সুনীল জুতা পরিয়া আসে নাই ইচ্ছা করিয়াই। বহুদিন পরে দুটি পা আজ মাটির আস্বাদ পায়। কলিকাতায় তো মাতা মৃত্তিকার সহজ স্পর্শের সহিত মানুষের চিরবিচ্ছেদ। আজ তাই বড় ভাল লাগে একটু-ঠাণ্ডা একটু-নরম গাঁয়ের এই ভিজা পথখানি।

এবার বর্ষা আসিয়াছে দেরীতে—যাইতেও দেরী করিতেছে। আশ্বিন সুরু হইয়াছে। আকাশে আর কালো মেঘ জমে না। সকালে সোনালী রোদ। রাত্রে নীল আকাশে পেঁজা-তুলার মত সাদা সাদা মেঘ। অথচ ক্ষেত-খামারে এখনো হাঁটুসমান জল—খালগুলিতে এক-গলা। রাস্তায়

কাদা শুকায় নাই। সাঁকো-গুলি তেমনি উচু। খালের মুখে গড়ায় এখনো মাছ পড়ে নেহাৎ মন্দ নয়।

সন্ধ্যা লাগে-লাগে। নদীর ওপারে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য্য ডুবু-ডুবু। এখনি ঝাঁ করিয়া তলাইয়া যাইবে ঐ জ্বলন্ত সোনার থালাখানি।

সুনীল খানিক চাহিয়া থাকে নিষ্পলক। ছোটবেলায় মাইল দেড়েক হাঁটিয়া—আজো স্পষ্ট মনে পড়ে—ভাঙন-লাগা নদীর পাড়ে সূর্য্যাস্ত দেখিতে যাইত দল বাঁধিয়া। সে কি আনন্দ! আজ সেই ভাঙন আর অস্ত একেবারে হাতের কাছে—ঘরের দুয়ারে! নদী আর কয়েক পা আগাইয়া আসিলেই—ব্যস্! আসন্ন ক্ষতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তবু ভাল লাগে আজো।

অণিমাদের বাড়ীর বাঁশঝাড়ের কাছে আসিতেই ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিল—দত্তবাড়ীর পূজার বাজনা। সঙ্গে কাঁসর, ঘণ্টা আর শঙ্খধ্বনি। এক ঝাঁক হুলুধ্বনিও শোনা যায়। ঢাকীদল তাহাদের আগমন ঘোষণা করিতেছে। বোধ হয় সেই প্রসন্ন ঢালীরই দল। নাগার্চীরা আর ও-বাড়ীর পূজায় বাজায় না। দত্তদের আর সে-অবস্থা নাই!

আজ অধিবাস। কাল প্রথম পূজা।

বকুলতলায় এককালে দশখানি প্রতিমা গড়ান হইত। সুনীল বড় হইয়াও প্রতি বার সাতখানি পূজা হইতে দেখিয়াছে। এখন শুধু দত্তরাই ও-পাট বজায় রাখিয়াছে কোন মতে। উমেদপুর, বাইলডাঙা, লক্ষ্মীদহ ও আশে-পাশের আরও খানকয়েক গ্রাম মিলিয়া এখন চার-পাঁচখানির বেশী দুর্গা পূজা হয় না।

অণিমার মা সুলতা তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়া ঘরে ফিরিতে-

ছিলেন, পিছন হইতে সুনীল ডাকিল, "ন'কাকীমা! আমি এসেছি।"

"কে, বাদল? আয় বাবা, আয়। ন'কাকীমাকে বুঝি তোর এতক্ষণে মনে পড়ল?—চল, ঘরে চল। কেমন আছিস?"

ঘরে আসিয়া সুনীল তাঁহার পায়ের ধূলা নেয়, "ন'কাকা কোথায়?"

"আর কোথায়!—দত্তবাড়ী। রাতদিন পাশার আড্ডায়।—অনু তোদের ওখানে?"

"হুঁ, ও পরে আসছে।"—সুনীল একটা জলচৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া সুলতাকে একবার দেখিয়া লইল। সেই সুন্দরী ন'কাকীমা যে একেবারে বুড়ী হইয়া গেল ইহারই মধ্যে!

"তোকে দেখে যে আজ আমার কী আনন্দ, বাদল!—তোর তো মনে নেই, মনে থাকবার কথাও নয়, ছোটবেলায় একবার আমার কোলে এলে আর কারু কাছেই তুই যেতে চাইতিস্ না—তোর মার কাছেও না।"

"মার কাছে সব শুনেছি কাকীমা।"

সুলতা খুশী হইয়া একগাল হাসিয়া কহিলেন "এখন বড় হয়েছিস, এবার বে-থা কর। আমরা সব আশা করে বসে আছি যে।"

"বদলদা বিয়ে করবে ক'নে কোথায় গো? হরনাথ পালকে বৌ গড়াবার ফরমাশ দেওয়া হয়েছে," বলিতে বলিতে অণিমা চৌকাঠের ওপার হইতে আত্মপ্রকাশ করিল এক নাটকীয় আকস্মিকতায়।

"ন'কাকীমা, অনু বড্ড কথা শিখেছে।"

"শিখবে না ?—আর কি ছোট আছে।"

"তাই বলে আমার সঙ্গে ও ইয়ার্কি দেবে ? আমি ওর দাদা হই না ?"

"বা রে ! ইয়ার্কি দিলাম কখন ! সত্যি কথা বললে সবারই লাগে"—অণিমা মুখ টিপিয়া হাসে।

ঘরের মধ্যে ঘনায়মান অন্ধকার। মুখের ভাষা পড়িবার উপায় নাই। বিনিময় চলে শুধু শব্দের সঙ্গে শব্দের।

সুলতা মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "ঝগড়া করিস্ পরে।—আগে হ্যারিকেনটা জ্বেলে দে তো।—তেল আছে কিনা দেখে নিস্।"

অণিমা উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেল। সুলতা এই সুযোগে অমনি সুরু করিলেন—"ধুবড়ি থাকতে ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। পড়াশুনায় তো ওর মন ছিল খুবই।—তা আমার পোড়া অদৃষ্ট ! নইলে এদ্দিনে ম্যাট্রিক দেবার সময় হয়ে আসত।"

"বাড়ীতে একটু-আধটু পড়াশুনা করে তো ?"

"বই কোথায় ? ছেলেগুলোরই কিচ্ছু হচ্ছে না, আবার মেয়ের পড়া !" বলিয়া সুলতা খানিক চুপ করিয়া রহিলেন।

এ-সব তিক্ত কথা ভাল লাগে না ! পুরানো একঘেয়ে খবর যত ! সুনীল ক'দিনের জন্য বাড়ী আসিয়াছে। চায় নূতন সংবাদ—এ-পাড়ার, ও-পাড়ার, সারা গ্রামের।

ন'কাকীমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সুনীল অন্য এক প্রসঙ্গ তুলিল, "ন'কাকীমা, তুমি নাকি এক স্কুল খুলেছ ? পাড়ার মেয়েদের সব পড়াও।"

"আমি আবার পড়াব! তোর ন'কাকীমার বিদ্যের দৌড় তো জানিস্। কি করব বাবা, পেটের দায়ে—মাঝে মাঝে অনুর কাছ থেকে দেখেশুনে নিই।"

"ক'জন পড়ে?"

"পনেরো।—আমাদের পাড়ার মেয়ে মাত্র চারটি। কাঁসারীদের এগারটি মেয়ে আসে।"

"কেন, সরকার পাড়ার মেয়েরা?"

"—তারা উমেদপুরের মেয়ে-ইস্কুলে যায়। তোর ঠাকুর্দ্দা কত বলেছেন তারা আমার ইস্কুলে পাঠাবে না।"

"কেন?"

অণিমা আলো জ্বালিয়া আনিয়াছে। সুনীল আলোর সুযোগে একবার তাকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। নিটোল নিখুঁৎ একটা পাতলা গড়ন। পরণে আধ-ময়লা একখানি আটপৌরে শাড়ি। সস্তা একজোড়া শাঁখা হাতে। বিকালে আজ খোঁপা বাঁধে নাই। পিঠ ছাইয়া নামিয়া আসিয়াছে ফাঁপানো চুলের গোছা। আলুথালু কেমন এক অশিষ্ট মাধুর্য্য!

স্নেহলতা বলিয়া চলিলেন, "তোর ন'কাকার স্বভাব তো তোদের অজানা নেই। এবার উল্টো রথের দিন মধু সেনের ছেলেকে নাকি একটা চড় মেরেছিল। সে নিয়ে কত হাঙ্গামা! ওদের ছেলে মেয়েরা তাই আমার ইস্কুলে আসবে না।"

"কাকা শুনলাম টিউসন করেন?"

"ওতে কি সংসার চলে!—হাই ইস্কুলে একটা মাষ্টারি খালি হয়েছিল। কত বললাম। বলে, আমি করব পনের টাকার মাষ্টারি?"

"কথাটা তো মিথ্যে নয় কাকীমা—তবু বিপদে পড়লে আগেকার কথা সব ভুলে যেতে হয়।"

"হুঁ, তোর কাকার আবার আছে সে সব খেয়াল। তাকে—"

অণিমা বাধা দিয়া কহিল, "মা চাবীটা দাও।"

"কেন?"

"চিনি বার করব।—বাদলদাকে চা ক'রে দেব।"

"চা পাবি কোথায়?"

"বড়মার কাছ থেকে চেয়ে এনেছি—বাদলদা নিয়ে এসেছেন।"

সুলতা হাসিয়া উঠিলেন, "হুঁ, তুই পরের ধনে পোদ্দারি করছিস্!"

"বা-রে, বড়মা বুঝি পর?"

সুনীল হাসিয়া ওঠে, "ঠিক বলেছিস অনু।—কাকীমা আমাদের পর মনে করেন।"

সুলতাও হাসিয়া গমনোদ্যত অণিমাকে কহিলেন, "খালি চা দিসনে যেন। কলসীতে মোয়া আছে। তাকের উপর থেকে পেড়ে নাড়ু ও গোটা কয়েক দিস্।"—

অণিমা চাবি লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া যায়। সুনীল আর একবার চোখ বুলাইয়া নিল চারিদিকে। আজো সেই চারচালা বড় ঘর-ই দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু ভিতর একেবারে ফোঁপরা। আধ-ময়লা বিছানা, তেলচিটে বালিশ, পুরাণো আলনায় খানকয়েক ময়লা কাপড়—

এই গুটিকয়েক নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের মধ্য দিয়া অণিমাদের দুরবস্থার সুস্পষ্ট প্রমাণ হাতে হাতে মিলে।

সুলতা তার পূর্ব্ব প্রসঙ্গেরই জের টানিয়া চলিলেন,—"তোর কাকার কথা কওয়াও যায় না, সওয়াও যায় না। ঘরে আটার বছরের মেয়ে। আমার তো ভাবনায় চিন্তায় রাত্রে ঘুমই হয় না, বাবা। তাঁর বুঝি এতটুকু হুঁস্ আছে! দু'বার দুই সম্বন্ধ এল। তাদের আমল-ই দিলে না। বলে কি, ছেলের অবস্থা ভালো না—বংশও ভাল নয়। কোন্ পয়সাওয়ালা কুলীন পাত্রের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে দেবে তা সে-ই জানে।"

"কাকীমা, স্কুল থেকে তোমার কী আয় হয়?"

"দু'সের করে চাল দেয় প্রত্যেকে,—আধ মনের কিছু বেশী পাওয়া যায়। অনেকেই ঠিক মতো দিতে পারে না। যাক্ সংসার না হয় চলে-না চলে-না করেও কোন গতিকে চলে যাচ্ছে কিন্তু মেয়ের বিয়ের যে কী হবে বাদল! আর কিছুদিন বাদে বুলুও তো আমার ঘাড়ে চেপে বসবে।"

সুনীলের স্মরণ হইল, অনুর পর এক মেয়ে সে কোলে দেখিয়াছিল। তারপর ক'জন আসিয়াছে সে-খবর জানে না। প্রশ্ন করিল, "ওরা কোথায়?"

"বুলু, টুলু আর পাঁচু তো তোদের নীলু আর বাব্লুর সঙ্গে পূজো-বাড়ীতে গেছে—মণ্ডপ সাজানো দেখ্তে। শ্বশুর মশায় ফিরেছেন?"

"কে, ঠাকুর্দ্দা? না, তিনিও পূজোবাড়ীতে গেছেন।"

"তা হ'লে তাঁর সঙ্গেই আসবে ওরা। তোর কাকা কি আর রাত দুপুরের আগে ফেরে নাকি! ছেলেটাকে মাঝে মাঝে একটু আধটু

পড়াবে, তা-ও ওর কুষ্টিতে লেখে না। যদি কিছু বলি, আমার ওপর এমন খিট্‌খিটই করে ওঠে বাবা, সে আর কী বলব!"

অণিমা এক হাতে চা ও আর এক হাতে খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিল। সুলতা অমনি উঠিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, "ভাত চাপিয়ে এসেছিস?"

"না, যাচ্ছি—"

"তুই ওর সঙ্গে কথা বল—আমি-ই যাচ্ছি! আমার আহ্নিকও সারতে হবে।" বলিয়া সুলতা রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। যেন ভাত চাপানো আর আহ্নিক সারাটা এখনি না হইলে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইবে।

চায়ের পেয়ালায় একটু চুমুক দিয়া সুনীল আড়চোখে চাহিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে আসতে তোর এত লজ্জা—আর সন্ধ্যেবেলা একা চলে এলি, ভয় করল না?"—

"একা আসিনি তো। বড়মা পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি এক দৌড়ে চলে এলাম।" অণিমা যেন কত বড় সাহসের কাজ করিয়াছে এমনি ভাব দেখায়।

সুনীল মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে, "বয়স জিনিষটা কত বড় বাধা—আজ তোকে দেখবার পর থেকে সে-কথাটা ভাল করেই বুঝতে পারছি। সেই অনু, আজ তোরই কি না আমার কাছে এত লজ্জা!"

বয়সের উল্লেখে অণিমা কয়েক মুহূর্ত্ত মাথা নিচু করিয়াই আবার তুলিয়া লয়। সুনীলের কথার জবাব দিল অন্য দিকে চাহিয়া, "আপনিও বুঝি ছোটই রয়েছেন!"

সুনীল হাসিয়া ওঠে, "আর তুই যে আমায় 'বাদলদা তুমি' বলে

ডাকতিস, আজ সেটা 'আপনি' হয়ে গেল কী করে অনু? আসলে, আমরা আপন নেই আর। তুই-ও বড় হয়েছিস, আমিও বড় হয়েছি। শুধু বড়ই হয়নি রে, বদলেও গেছি। আমাদের আগেকার সম্বন্ধের চেয়েও বর্ত্তমানের বয়সের সত্যটা ঢের বড়। সে কথা ভুলতে চাইলেই কি আর এখন ভোলা যায় অনু!"

অনিমা আবার মাথা নোয়ায়। সুনীল তার লজ্জাটুকু উপভোগ করিয়া বলিয়া চলিল, "সাহস করে সেদিনের 'তুমি'টা বলতে যখন পারিস্ নি, তখন-ই বোঝা গেছে—আমরা অনেকখানি দূরের হয়ে গেছি।"—তারপর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া আবার কহিল, "তুমি বলায় দোষের কী এমন?—নমিতাও তার—"

সুনীল হঠাৎ কথার মাঝখানে থামিয়া যায়! অনিমা সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের উপর একটিবার স্থির দৃষ্টি বুলাইয়া নেয়। একটি অপরিচিত মেয়ের নাম উল্লেখ করিতে যাইয়া বাদলদা অমন করিয়া আটকাইয়া গেলেন কেন?

সুনীল তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গের মোড় ফিরাইয়া নেয়।

"অনু, তোর সেই কথা মনে আছে?"

"কোন্ কথা?"

—"দত্ত-বাড়ী পাঁঠা-বলি দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলি?"

"না। মনে নেই। তবে মার কাছে শুনেছি। আমি নাকি সেদিন সারারাত ঘুমের মধ্যে থেকে থেকে মাকে জড়িয়ে ধরেছি—আর ঐ এক কথা মুখে—দাশুখুড়ো পাঁঠাটাকে অমন করে কেটে ফেল্‌লে কেন গো!" বলিয়া অনিমা হাসিয়া ওঠে।

"তুই রক্ত দেখে সেই যে আমায় শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরেছিলি অনু—কিছুতেই আর ছাড়তে চাস না। বাড়ী অবধি আমার কোঁচার খুঁট ধরে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিস্। তোর সে সব কথা মনে নেই আজ—তখন তো তুই খুবই ছোট—ন্যাঙটা হয়ে নাইতে যেতিস আমাদের পুকুর ঘাটে।"

অণিমা লজ্জা পাইয়া মুখ ফিরায়। বাদলদা যেন কি! মুচকি হাসিয়া কহিল, "আপনার তো সব কথা মনে আছে দেখছি। সহরে থেকেও কোনো কথা ভোলেন নি আজো।"

"আমার সব কথাই মনে আছে রে। মায় তোদের মেয়েদের ব্রতের কথাও।"

"ঈস্!' অবিশ্বাসের ভাব দেখাইয়া অণিমা প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, বলুন দিকিনি, মঙ্গলচণ্ডী কোন্ মাসে হয়?"

'বোশেখ মাসে।'

'বলুন দিকিনি, মনসা পূজা?'

'শ্রাবণ সংক্রান্তি।'

'এবার পারবেন না। বলুন তো, জয়াজরি, নিস্তারিণী আর ইয়তলি বত্ত কোন্ মাসে কেন করে?'

সুনীল এবার বিপদে পড়ে। দই, চিড়া, নাড়ু প্রভৃতি প্রসাদের আস্বাদই মনে আছে কেবল। সে কি আজিকার কথা! কলেজে পড়িবার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে মাস দেড়েক বাড়ীতে থাকিত বটে; কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ছেলেমহলে দেশোদ্ধারের বাক্যযুদ্ধেই ছুটি ফুরাইয়া যাইত।

অণিমা হাসিয়া উঠিল, 'কেমন, হার মানছেন তো?'

"দাঁড়া, ভেবে বলছি।'

'ও আর হচ্ছে না।—আচ্ছা এবার বলুন তো ইলিশ মাছ ঘরে আনে কবে?'

"তা বুঝি আর জানি নে।—শ্রীপঞ্চমীর দিন, কেউ কেউ পরেও আনে।'

অণিমা উৎসাহিত হইয়া ওঠে। তার শহুরে বাদলদা আজো অনেক কথাই মনে রাখিয়াছেন। তার ধারণা ছিল বাদলদার এসব আর মনে নাই, মনে থাকিলেও বিশ্বাস করেন না আর। তাই দ্বিগুণ উৎসাহে আবার প্রশ্ন করে, "বুড়ির ঘর কোন্ মাসে পোড়ায়?"

"তুই আমায় বোকা পেয়েছিস নাকি?"

"বড়াই না ক'রে বলুনই না।"

"বুড়ির ঘর পোড়ানো হয় তো দোলপূর্ণিমার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায়।"

"এবার কিছুতেই পারবেন না। মাঘ মণ্ডলের বত্তের—বামুনদের মেয়েরা বড্ড সেয়ান, পৈতা জোগায় বিহান বিহান—এর পর কোন্ ছড়া বলুন তো?"

সুনীল এবার রাগিয়া যায়, "তুই বল্ তো, গোল্লাছুট, বৌ-ছোঁওয়া আর দাঁড়িবিদ্যা কেমন করে খেলতে হয়?"

"বা-রে! ও সব বুঝি মেয়েরা খেলে?"

"মাঘ-মণ্ডলও বুঝি ব্যাটাছেলের ব্রত?"

অণিমা সশব্দে হাসিয়া স্খলিত আঁচলটায় ভালো করিয়া বুক ঢাকিয়া

লয়। অতীতের সহজ স্মৃতির মাঝখানে বাধা দেয় বর্ত্তমানের সলজ্জ সচেতনতা। সুনীল মনে মনে হাসে। তার কাছে অণিমা জলের মতই স্পষ্ট ছিল একদিন। সেই মুখ, সেই নাক, সেই হাত-পা, সেই বুক— সবই তো আছে, শুধু আকারে বাড়িয়া আজ শাড়ির আড়ালে আত্মগোপন করিয়াছে এই যা। তবু কি ব্যবধান! পরিচিত প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আজ অপরিমেয় রহস্যভারে একেবারেই অপরিচিত।

"বাদলদা, আপনার কড়ি-খেলা মনে আছে?"

"হুঁ"

"আমাদের পূবের ভিটার বারান্দায় সেই ঘর-আঁকা—আমি, আপনি মলিনা আর সোনামাসী দশ-পঁচিশ খেলতাম। সোনামাসীকে মনে আছে আপনার?"

"একটু একটু মনে পড়ে। তিনি মরে গেছেন সে-ও তো আজ দশবারো বছরের কথা রে!"

হঠাৎ পূজা বাড়ীর বোধনের বাজনা দ্বিগুণ জোরে বাজিয়া উঠিল: কানে যেন তালা লাগে। অণিমা ও সুনীল নিরুপায় হইয়া কথা বন্ধ করে।

খানিক বাদেই বোধনের বাজনা থামিয়াছে। অতীত স্মৃতির রেশটুকু থামে না।

দুজনেই চুপচাপ। খানিক বাদে সহসা অণিমা মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিয়া বসে, "বাদলদা!"

"কী?"

—"নমিতা কে?"

"কেন ?"—সুনীল প্রমাদ গণিল।

"এমনি জিগ্‌গেস করলাম। আপনাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে না-চিনি এমন তো কেউ নেই। কোনো দিন নমিতা বলে কারু নাম শুনিনি তো! এ বুঝি আপনার কোনো বন্ধুর—"

"বন্ধুর কী ?"

"বোন-টোন হবে।"

অণিমার ইঙ্গিতটা সুনীল বুঝিয়াছে। কহিল, "বন্ধুর বোনও নয়, বন্ধুর বৌ-ও নয়।"

"তবে ?"

"আমার ছাত্রী। তাকে আমি পড়াই। আসছে বছর বি-এ পরীক্ষা দেবে।"

"হুঁ।" অণিমার এই ছোট্ট অনুনাসিক মন্তব্যে অনেক কিছুই বোঝায়।

"এর মানে কী অনু ?"

অণিমা কথাটা সরাসরি বলিয়াই ফেলিল, "তাই আপনি বিয়ে করতে চান না ?—বড়মা'র পছন্দ—করা মেয়ে তাই বুঝি আপনার মনে ধরল না ?"

"অনু, তুই যা ভাবছিস তা নয়। গ্রামে থেকে তোদের ধারণাটা বড় ছোট, ভাবিস্ একটি ছেলে একটি মেয়েকে পড়াতে গেলেই—অমনি প্রেম-টেম একটা কিছু হতেই হবে।"

কৃত্রিম রোষ দেখাইয়া অণিমা কহিল, "আমি তাই বলেছি নাকি ?"

"বাকিও কিছু রাখিস্ নি।"

অণিমা চুপ করিয়া হাসিতে থাকে।

"তুই যা ভাবছিস তা নয়। তুই-ই যখন বুঝতে চাস না, মা শুনলে তো আরো বেশি ভুল বুঝবে।"

—"আমায়ই বা বিশ্বাস করে বলতে গেলেন কেন ?"

—"হঠাৎ যখন বেফাঁস বেরিয়েই পড়েছে মুখ থেকে, কী আর করি, বল।" সুনীল হাসিয়া উঠিল।

"বাদলদা, নমিতা বুঝি দেখতে কালো ?"

"কেন ?"

"হ্যাঁ, তা-ই।"

"তবে তাই।—তুই কী করে জানলি ?"

"আমি গুণতে জানি কিনা।"

সুনীল হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, "আমি তোর চেয়েও ভালো গুণতে জানি। এই খানিক আগে মা তোকে বলছিল, আমি কালো মেয়ে বিয়ে করব বলেছি। এই না তোর জ্যোতিষী বিদ্যে ?"—

"চটছেন কেন! হঠাৎ কালোর উপর দরদ দেখে তখনি আমি বুঝে নিয়েছি।"

"বেশ করেছিস্। এখন এ নিয়ে মার কাছে—"

অণিমা হাসিয়া উঠিল, "ভয় নেই। বলব না।"

"ভয় আবার কিসের ?"

"তাই নাকি! তবে অত গোপন করা কেন ?"

সুনীলের জবাব দিবার আগেই সুলতা ফিরিয়া আসিয়াছেন বেরসিকের

মত, নিতান্ত অসময়ে। সুনীল অমনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "যাই কাকীমা, কাল আবার আসব।"

"এখনি যাবি?"

"হ্যাঁ, দত্ত বাড়ী একবার যেতে হবে। চক্কোত্তি মশাই, নন্দদা—কারু সঙ্গে এখনো দেখা করিনি। বাড়িথেকে প্রথম বেরিয়েই তোমার এখানে এসেছি।"

"তা আমি আগেই জানতাম। তুই তো আমার নিজের ছেলের মতোই।—অনু তো তার বাদলদা বলতে অজ্ঞান।—এবার ক'দিন থাকবি?"

"ছুটি মাত্র ছ'দিনের। তবে, পাওনা ছুটি নিয়ে দশদিনের ছুটি।—এবার তোমার স্কুলটা ভালোভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাব। দলাদলি ভাঙ্গতে আর কতক্ষণ।"

"আমি তো ওঁকে কতদিন সে কথাই বলেছি, বাদল এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবাই ওর কথা মানে।—একমাস ধরে আমি আর অনু রাতদিন ভাবছি, আমাদের বাদল আসবে কবে!"

ঘরের চৌকাঠের বাহিরে আসিয়া সুনীল ফিরিয়া দাঁড়ায়।

"বাদলদা! অন্ধকারে যেতে পারবেন তো?"

"অন্ধকার আবার কোথায় রে! দিব্বি বেশ-জোছ্‌না।"

"তবু একা-একা।—আপনি এখন সহুরে লোক।"

"চুপ্‌ কর! গাঁয়ের পথঘাট এখনো আমার মুখস্ত—তোর চেয়ে ঢের বেশি চিনি।"

অণিমা পিছন থেকে বিদ্রূপের সুরে কহিল, "ঈস!"

"প্রমাণ চাস্? আমি এই এখান থেকে চোক্ বুজে এখন সটান উমেদপুর বাজারে চলে যেতে পারি তা জানিস্?"

অণিমা সহাস্যে আলোটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরে:

"যাই কাকীমা?"

"যাওয়া নয়, এস গে বাবা।"

দত্ত বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের কোলাহল কানে আসে। অনেক পরিচিত কণ্ঠস্বর। পূজা-বাড়ী ভিড় জমিয়াছে।

নন্দ দাস, তারিণী খুড়ো, দেবকীর বাবা, সতীশ পাকড়াশী—গ্রামের অনেকেই মণ্ডপে বসিয়া আছেন। চার পাঁচটি ছেলে রঙীন কাগজ লইয়া শিকল বানাইতে বসিয়াছে। দু'জন কাঠের থামে কাগজের পদ্ম আঁটিতে ব্যস্ত। গ্যাসের আলোয় জনকয়েক ছেলে ভবানী দত্তকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি গম্ভীরভাবে নির্দ্দেশ জানাইয়া রাখিতেছেন শেষ রাত্রে সাজি লইয়া কে যাইবে কোন্ পাড়ায়—কাহার উপর বেল-পাতা আনিবার ভার, কে কে যাইবে রহিমপুরের লক্ষ্মী-দীঘি থেকে পদ্ম যোগাড় করিতে।

সুনীলকে দেখিয়া সবার আগে নন্দ দাস আগাইয়া আসিল—"এস ভাই, এস। এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম বাদল!"

প্রণম্যদের প্রণাম আর নমস্যদের নমস্কারের পালা শেষ হইয়াছে। তারপর চলে নানা-কথা, নানা প্রশ্ন। পূজায় এবার কে কে বাড়ী

আসে নাই—কে কে হয় তো কাল-ও আসিয়া পৌঁছিতে পারে।—দাশু সেনেরা এতদিন পরে এবার বাড়ী আসিল। সঙ্গে কত লোক—ঠাকুর, দারোয়ান, ডজন খানেক চাকর, বিস্তর ছোট-বড় বাক্স-বিছানা—মেয়েরা নাকি জুতা পায়ে গড়্ গড়্ করিয়া গ্রামে ঢুকিয়াছে—ইত্যাদি।

খানিক বাদে একটু নিরালায় ডাকিয়া নন্দ দাস কহিল, "বাদল, কাল তোমাদের বাড়ী আমি দু'বার করে গেছি। আজ বড়কত্তা ধরে বললেন, তুমি না হ'লে চলবে না নন্দ। সারাদিন আজ একটিবার এখান-থেকে—এই তো ওখানে—নিজের বাড়ীতে পর্য্যন্ত যাবার সময়টুকু পাই নি ভাই। তা নইলে তুমি এসেছ শুনে আমি কি আর দৌড়ে যেতাম না এতক্ষণে!"

"কেমন আছ নন্দদা?"

"আমার আর থাকা না-থাকা।—তুমি তো ভাই সবই জানো। তোমার ঋণ আমি এ-জীবনে···"

"ওসব কথা তুলছ কেন?—আমি এই তোমাদের বাড়ী হয়ে আসছি। বৌদিকে এবার বড্ড কাহিল দেখছি।"

"হবে না দাদা।—এই" বলিয়া নন্দ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি আর তর্জ্জনী ঠোকাঠুকি করিয়া টাকা বাজাইবার ভঙ্গি দেখাইল।

"বৃন্দাবন পালের গদীতেই কাজ করছ?"

"যাব আর কোথায়?—আর ব'লো না ভাই, পূজোর সময় এত করে অনুরোধ করলাম, পাঁচটা টাকা বেশি দেবার জন্যে, পরের মাসে কেটে নেবে। তা শালা দিলে না," তারপর গলা আরো একটু খাটো করিয়া কহিল, "দুখের কথা কাকে বলি বাদল। ছেলে-পেলেদের

কোন রকমে একখানা করে ধুতি কিনে দিয়েছি। ছবি আর টেপিকে এবার ভাই পূজোর কাপড় দিতে পারলাম না। তোমার বৌদি না হয় নাই পেল, সাত সন্তানের মা, কী বলো ?—আমার কাছে এখানো তো ওরা দুজন কচিকাঁচা !”

তার এ-সব ভণিতার উদ্দেশ্য সুনীল বেশ জানে। আজ যদি নাই বা চায়, কালই সে সুনীলের কাছে গিয়া চুপি চুপি হাত পাতিবে। এমন অনেকবার দিয়াছে সুনীল ···

চণ্ডীমণ্ডপের একদিকে পুরোহিত ফর্দ্দ অনুযায়ী জিনিষপত্র বুঝিয়া লইতেছেন। মণ্ডপী বৃন্দাবন একরাশ রেকাব ধুইয়া রাখিতেছে। জলশঙ্খ, কোশা-কুশি, তামার টাট, চন্দনের বাটি, পুষ্পপাত্র তাম্রকুণ্ড, সরা, কুলা, পঞ্চপ্রদীপ, ধূপধুনা ধূপতি, খানকয়েক কুশাসন—ছাতা আর্শি সব কিছুই একপাশে মজুত রহিয়াছে।—মায় সন্ধিপূজার সরঞ্জাম পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

প্রতিমা এবার আরো ছোট হইয়াছে। পূজার অন্যান্য ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণও কমিয়া আসিয়াছে অনেকখানি।

সুনীল প্রতিমার দিকে তাকাইয়া আছে একদৃষ্টে। মনে পড়ে ছোট বেলার কথা। পূজার ধর্ম্মাঙ্গীণ অনুষ্ঠানে বিশ্বাস হারাইয়াছে বহুদিন, কিন্তু উৎসবের শতেক খুঁটিনাটি আজও আনন্দ দেয়—কত কথা আর কত সাথীকে স্মরণ করার এক নিমেষে।...

সেই যে দত্ত বাড়ীর মণ্ডপে কুমাররা আসিয়াছে, এইমাত্র খবর পাওয়া গেল। উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলে বাদল, বীনু, সমীর, পল্টু, অনু, আন্না, কালীদি—আরো অনেকে। কুমারের দল একমেটে করিতে আসিয়াছে

আর কি ঘরে থাকা যায়! মা পিছু ডাকে, "ওরে খোকা যাস্ নে, যাস্ নে। কাল গেছে তোর জ্বর—।" কার জ্বর! কে শোনে মায় নিষেধ!

শিশু-বাহিনী দৌড়িয়া গিয়া হাজির হয় দত্তবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে। দলপতি হরনাথ পাল একখানি দা দিয়া কাঠামোর সর্ব্বাঙ্গ হইতে গেল বারের শুক্‌নো মাটি কাটিয়া ফেলিতেছে।...দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়ে। কুমাররা তখনো খড়ের গাদায় হাতই দেয় নাই—কেবল কাদা-মাটি পিশিয়া-থাশিয়া এক একটা বড় বড় তাল বানাইতেছে। অধৈর্য্য শিশুর দল আর কত বসিয়া থাকিবে! এ-বেলা অপেক্ষা করিয়া আর লাভ নাই।...

বিকালে আবার সকলে ভীড় করে দত্তবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে।...তারপর তিন দিন ধরিয়া বিস্মিত শিশু-মহলের চোখের উপর দিয়া খড়-কুটার কঙ্কালে ধীরে ধীরে কাদা-মাটির অস্থিমজ্জা দেখা দেয়। মুলার মত দাঁত বাহির করিয়া শুঁড়-বাঁকানো গণেশ ঠাকুর বসিয়া আছেন স্বস্থানে। সিংহ-মশাই লক্‌লকে জিহ্বা মেলিয়া মস্ত বড় হাঁ করিয়া আছে। মস্তকহীন অসুর সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। আর সব পুতুলের তো মুণ্ডই নাই।...

একমেটে শেষ। ছেলে-মেয়েদের কিন্তু ভাবনার অবধি নাই। রোজ আসিয়া অসমাপ্ত পুতুলগুলির খোঁজ লইয়া যায়। কাঁচা মাটি একটু একটু করিয়া শুখায়; ক্রমে ক্রমে হয় ফিকা মেটে; অবশেষে কঠিন ছাই-রঙের মৃণ্ময়-দেহ। কোথাও কোথাও একটু-আধটু চিড় ধরে। এমনি করিয়া তাহারা দু'বেলা প্রতিমার দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া যায় আনন্দে আর আতঙ্কে।

দশ-পনের দিন ব্যগ্র অপেক্ষার পর আবার আসে কুমারের দল। একদিন আর একরাত্রির মধ্যে দো-মেটে শেষ হয়। শিশুর দল অবাক হইয়া দেখে অসুরের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখের ভাব। নিজেরই দাঁতে নিজেরই ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া সিংহের সঙ্গে ভীষণ লড়াই সুরু করিয়া দিয়াছে। হরনাথ পালের সুনিপুণ হাতে মহিষাসুরের সুদৃঢ় পেশিগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে অদ্ভুত। আগেকার সুপুষ্ট কণ্ঠাস্থি এবার আরো সুস্পষ্ট। সিংহের থুঁতনিতে মস্ত এক ঘুষি মারিয়া লোহার মত শক্ত হাঁটু দিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে —কিছুতেই আগাইয়া আসিতে দিবে না। সিংহ তার পাঁচনখা থাবায় অসুরের কোমরের কাছ থেকে মাংসশুদ্ধ এক খাবল তুলিয়া আনিয়াছে। তবু সিংহ মশাই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অসুরের মত অসুর বটে!...লক্ষ্মী-সরস্বতী সুন্দর শাড়ী পরিল দেখিতে দেখিতে। ভগবতীর দশ হাতে দশ-জোড়া বালা। কার্ত্তিকের ঝাঁকড়া চুলে লম্বা টেড়ি...

তারপর একদিন রঙ দিতে আসে—পূজার দিন চারেক আগে। চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের ছেলে-মহল ভাঙ্গিয়া পড়ে। নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, দেখে কেবল রঙের বাটি আর তুলির টান। একদিনের মধ্যেই মা দুর্গার কাপড়ের কি সুন্দর পাড়, হাতে তাঁর সোনার চুড়ি; পায় তাঁর রূপার খাড়ু। কার্ত্তিকের একজোড়া কালো কুচকুচে গোঁফ। গণেশের ইঁদুরের মত চোখ দুটি মিট্ মিট্ করে। অসুরের তো চোখ নয়, যেন কামানের গোলা!

ছেলের দল তর্ক করিতে করিতে বাড়ী ফিরে। কেউ বলে—এবার

অসুরই জিতবে। কেউ বলে—ঈস্! বাঘই জিতবে। দেখেছিস, কী থাবা! কেউ বা সকল অভিমতের প্রতিবাদ জানাইয়া বলে—আমার কাকা বলেছেন, অসুরের গায়েই বেশি জোর।...

সেই সাথীরা সব কে কোথায় আজ ছিটকাইয়া পড়িয়াছে!—বীনু থাকে রেঙ্গুন; এক যুগ হইল দেশে আসে না। সমীর বড় হইবার আগেই মরিয়া গিয়াছে। পল্টু ধূবড়ীতে ষ্টীমার আফিসে ত্রিশ টাকার কেরাণী;—কাচ্চা বাচ্চা গোষ্ঠীগোত্র লইয়া সপরিবারে সুখেই নাকি আছে। কালীদির বিবাহ হইয়াছে অনেক দূরে—দিনাজপুর। সে এখন পাঁচ সন্তানের মা। আন্না এখন বিধবা—দেবরের সংসারে কেমন আছে কে জানে। বাকি রহিল কেবল সব চেয়ে ছোট ছিল যে। সে অণিমা...

মণ্ডপের একপাশে তখন শ্রীনাথ চাটুজ্যে, লোকনাথ হালদার ও আরও জন কয়েকে মিলিয়া তামাক টানিতেছিল আর সমালোচনা করিতেছিল সুনীলেরই। লেখাপড়া শিখিয়াও তাহার জ্ঞানবুদ্ধি হয় নাই, শুধু অহঙ্কারই বাড়িয়াছে—নহিলে সারা দিনে গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা করিবার সময় হয় নাই তার, বাহির হইয়াছে এই রাত্রিবেলা, চণ্ডীমণ্ডপে এক বারে সবার সঙ্গে দায়সারা-গোছের কর্ত্তব্যটা সারিতে।

সুনীলকে তখন মণ্ডপের আর এক কোনে টানিয়া নিয়াছে নন্দ দাস। তাহার ভাবসাব দেখিয়া মনে হয় কি এক ষড়যন্ত্র আঁটিতেছে যেন।

"আজকাল কত দেয় ওরা?"

"সেই আট টাকা। ওতে এতগুলো লোকের কথনো হয় ভাই, তুমিই বলো না।"

সুনীল কোন মতামত জানায় না। নন্দদাস চালাক লোক। আজ ভূমিকা সারিয়া রাখিতেছে।

"বড় খুকীকে দেখলে তো?"

"হঁ্যা,"

"বিয়ে দিতে হবে তো?—একটা কাণা-কড়ির যোগাড় নেই যে। তা আর কেউ না জানুক তুমি তো জান ভাই, আর জানেন ভগবান।"

"অত ভাবনা কিসের নন্দদা! তোমাদের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিতে তো আর টাকা লাগে না—ছেলেকেই বরং টাকা দিয়ে মেয়ে নিতে হয়।"

"কী যে সব বলো বাদল," নন্দ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল,—"বাপ-ঠাকুরদা কী করেছে না করেছে জানি নে—তোমাদের সমাজে যখন আছি, তখন অমন কাজ করতে গেলে তোমরাই বা শুন্‌বে কেন, কী বলো? নন্দদাস প্রাণ গেলেও মেয়ে দিয়ে কারু কাছ থেকে একটা ঘষা পয়সাও নেবে না, তোমরা দেখে নিয়ো বাদল।"

নরেশ সরকার আর দাশু সেনের মধ্যে তখন বিতর্ক সুরু হইয়াছে ইউনিয়ন বোর্ড সংক্রান্ত কি এক কথা লইয়া।

"বাদল, তোমায় একটা কথা সাবধান করে দিচ্ছি" বলিয়া নন্দ অনুচ্চ কণ্ঠ আরও খাটো করিয়া জানাইল, "সরকার মশায় কিন্তু পুলিশের স্পাই।"

"কার কথা বল্‌ছ?"

"নরেশ সরকার—অনুর বাবা। ও খলকে বিশ্বাস করো না। সার্দহের পাঁচু ভৌমিককে তো উনিই ধরিয়ে দিয়েছেন। আরো কত ছেলের যে উনি—সাবধানে থেকো বাদল ভাই।"

"কেন?" বাদল হাসিতে থাকে।

"তোমার ক্ষেতি করতে পারে।"

"থামো নন্দদা। আমি তাকে ভয় করতে যাব কেন! তোমার কথা যদি সত্যিও হয়, যারা ভয় পাবার তারা পাবে।"

তথাপি নন্দ দাস নরেশ সরকারের বিরুদ্ধে আরও অনেক কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ সুরু হইল তুমুল ঝগড়া। পুরোহিত মানু চক্রবর্ত্তী পায়ের খড়ম খুলিয়া মণ্ডপী বৃন্দাবনকে মারিতে উদ্যত। বৃন্দাবন খানিক আগে বোধ হয় ছোট কলিকায় টান মারিয়া আসিয়াছে, সে-ও চোক রাঙাইয়া রুখিয়া দাঁড়ায়। সকলে মিলিয়া ছুটিয়া আসে। চারিদিকে হৈ চৈ। নন্দও ভীড়ের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল!

সুযোগ বুঝিয়া সুনীলও সরিয়া পড়ে। রাস্তায় আসিয়া নরেশ সরকারের কথাটা একবার ভাবিয়া দেখে। বিশ্বাস হয় না। নন্দ দাস চিরকালের মিথ্যাবাদী।

অল্প-অল্প জ্যোৎস্না। দুপাশে গোয়াড়া আর মাদার আর কাফিলার চাড়া। মাঝে মাঝে বাঁশ ঝাড়। আনমনে পথ চলিয়াছে সুনীল। তাহাকে একা পাইয়া পদ্মা আবার তাহার দুর্ব্বার অভিযানের কথাটা স্পষ্ট শুনাইয়া দেয়। দত্তদের এই আমবাগান নদী হইতে নেহাৎ কাছে নয়। তবু মনে হয় কত কাছে—দু'পা গেলেই

বুঝি! এই শব্দ-নৈকট্য ধরিয়া বিচার করিলে সুনীলদের বাড়ী এখন নদীগর্ভে—যেন বাড়ী ফিরিয়াই দেখিবে সে, কোনখানে কোন চিহ্ন নাই।

অনুদের বাড়ীর কাছে আসিতেই পথে যতীন ঘোষালের মার সঙ্গে দেখা। সঙ্গের ছোট ছেলেটার হাতে একটা লণ্ঠন।

"বাদল না?"

"হ্যাঁ। এই রাত্তিরে আমাদের পাড়ায়?"

"তোমার কাছেই এসেছিলাম বাবা। যতুর কোন খবর জানো তুমি?"

"আমার সঙ্গে ওর দেখা নেই আজ তিন-চার মাস।"

"দ্যাখো তো বাবা, আজো এল না ও। চাকুরি নেই, তাই বলে কেউ পূজোয় বাড়ী আসে না নাকি? ও আসবে বলে বৌমাকে কাল তার বাপের বাড়ী থেকে আনিয়েছি।"

যতীন সুনীলেরই পাঠশালার সহপাঠী। কৈশোরের কত সকালবিকালের খেলার সাথী। কলিকাতায় এক খবরের কাগজের আপিসে কাজ করিত—প্রেসের কম্পোজিটর। লাইনো-টাইপ মেশিনের আবির্ভাবে চাকুরিটি হারাইয়াছে। তারপর কোথায় কি করে সুনীল তার খবর রাখে না।

উপস্থিত উৎকণ্ঠিত জননীকে একটু সান্ত্বনা দিবার জন্যই কহিল, "ভাববেন না। কাল হয় তো এসে যাবে। না এলে জানবেন, নতুন একটা কাজ পেয়েছে হয় তো।"

"তা হ'লেও চিঠি দেবে তো একখানা?"

"রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন ?—চলুন আমাদের ওখানে।"

"না বাবা, তোমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসেছিলাম। এখন যাই। খালি বাড়ীতে বৌমাকে রেখে এসেছি। ক'লকাতা যাবার আগে যেন একবার খবর পাই, বাদল। তোমার সঙ্গে ওকে খানকয়েক আমসত্ত্ব পাঠিয়ে দেব।"

রাত প্রায় এগারটা। এখনো ঢাক বাজে দূরে-দূরে। সুনীল বিছানায় পড়িয়া কেবলি এপাশ-ওপাশ করে। ঘুম আসে না কিছুতেই। পদ্মা যেন বালিসের মধ্যে আটক-বন্দী। কানের মধ্যে একটানা আস্ফালন।

নদীর পাড় হইতে এইমাত্র একটা ধস্ নামিবার শব্দ ভাসিয়া আসে। অদৃশ্য ঐ ভূমিখণ্ডের জন্য বড় মায়া হয় সুনীলের। এতক্ষণে পদ্মা ঐ নিরীহ মাটির চাপ গিলিয়া গুলিয়া একাকার করিয়া লইয়াছে। নির্জ্জন রাত্রির বুকে অসহায় ভূমিটুকুর শেষবিদায়ের শব্দটা কি সৃষ্টি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই একটা নিষ্ফল নালিশ ?...

একথা সেকথা নানাকথায় মনের সামনে আবার আসে নমিতা সেন। দোতলার সেই পড়ার ঘর। পূবের জানালায় মুখ ফিরাইলে বাহিরে চোখে পড়ে, বাগানের এক কোনে গোটা কয়েক গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা...

রাসবিহারী এ্যাভিনিউর চওড়া দেহটা থেকে ডাহিনে-বামে বাহির হইয়া গিয়াছে অসংখ্য ডালপালা। তারই একটা কালো শাখার সঙ্গে লাল-কঙ্করের এক উপশাখার সংযোগ-কোনে ফ্রেমে-আঁটা ছবির মত ছাই রঙের গেটওয়ালা বাড়ীটার দোতলায়—মনে পড়ে—এক বিমুগ্ধ সন্ধ্যায় কয়েক সেকেণ্ডের এক গীতিনাট্য যেন। এখনো মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় নানা অর্থ নানা অনুমান। নমিতা মুখেচোখে এক ঝলক হালকা হাসি তুলিয়া কহিল, "এসেছেন এতক্ষণে? আমি বসে বসে ভাব্‌ছি আজ আর বুঝি এলেন না।"...

চোখের পাতায় তরল ঘুম গাঢ় হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে নমিতার পাশে আর একটি মেয়ে আজ বারবার অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিয়া যায়। তাই তো! অণিমা সত্যই আর সেই অণিমা নাই।

চার

অন্ধকারের পরদাখানি ক্রমে পান্‌সে হইয়া আসে। পাতলা আলোয় চারিদিক ছায়া-ছায়া ভাসা-ভাসা। কাক ডাকে। শিস্ দেয় শ্যামা আর দোয়েল। সুর তোলে আরো কত জানা আর নাম-না-জানা পাখী। সপ্তমী উষা! আজ প্রথম পূজা।

দত্ত বাড়ী ঢাক বাজে। আগরণী বাজনা। পূজা আজ। দুর্গা পূজা! সারা বাঙ্গলায়—প্রতি গ্রামে, ঘরে ঘরে। সম্বৎসরের মরা গাঙে তিনটি দিনের ভরা জোয়ার!

সুনীল নদীর পাড়ে আসে সূর্য্য উঠিবার বহু আগে। অনেকদিন পরে আজ দু'চোখ ভরিয়া একবার বকুলতলার প্রভাতী পালাটা দেখিবে। সামনের বছর এমন দিনে বকুলতলা হয়তো পদ্মার তলায়। কীর্ত্তিনাশাকে বিশ্বাস কি!

দত্তবাড়ীর বাজনার সঙ্গে এবার যোগ দেয় পলাশপুরের মুখুজ্যেদের

ঢাক-ঢোল। কান আর একটু সতর্ক করিলে, উমেদপুর চৌধুরী বাড়ীর বাজনাও স্পষ্ট শোনা যাইবে। মাঝে মাঝে কানে আসে নিকটস্থ মুসলমান-পাড়ার মোরগ-মুরগীর টানাটানা করুণ আবেদন।

এক রাত্রির মধ্যেই মাঠের জলে টান পড়িয়াছে। এঁটেল মাটি দেখা যায়! রাস্তার কাদা প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে দু একটি জল-ভাঙা—হাঁটুর উপরে কাপড় তুলিয়া পার হইতে হয়। দুই পায়ে কাদা মাখিয়া সুনীল নদীর পাড় ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে তাহাদের গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া চলিয়া যায় বহুদূরে।

এবার কি ভাঙা-ই না ভাঙিল! কুটিলা পদ্মার তালমাত্রার জ্ঞান নাই। সরল রেখায় ভাঙে না সে। কোথাও বেশী, কোথাও কম। ছেঁড়া পাউরুটীর মত এবড়োখেবড়ো নদীর পাড়—মাইলের পর মাইল। পদে পদে বাঁক। নিত্য নূতন মোড়। জল আর জল। ফেনা আর ফেনা। ঢেউএর পর ঢেউ আসিয়া পাড় ভাঙ্গিয়া ওঠে—ঝপাৎ ঝপ্। উঁচু ডাঙায় চিড় ধরে। হুড়মুড় করিয়া ধ্বসিয়া পড়ে ছোট বড় মাটীর চাপ। কাল সন্ধ্যায় ও যে বেতঝোঁপটা খাড়া ছিল, পরদিন সকালে তার কোন চিহ্ন নাই। পাড়ের মাটী হাঁ করিয়া তার অকালমৃত্যুর সাক্ষ্য দেয়।...পদ্মা! দুরন্ত পদ্মা! অশিষ্ট অসংযত রাক্ষুসী পদ্মা!

ঝুপ্ ঝাপ্!—আবার খানিক খাড়া পাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে ঢেউএর মুখে। সম্মুখের ঐ কাত-হওয়া কানাই-লড়ির গাছটার শেষ হইতে আর ইঞ্চি কয়েক বাকী। হিজল গাছটার শিকড়গুলি ফুঁড়িয়া নদীর দিকে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—কাণ্ডটা জলের দিকে হেলিয়া পড়িয়া প্রস্তুত হইয়াই আছে। তবু মাটির মায়া বড় মায়া—কিছুতেই ছাড়িতে চায় না!—

সুনীলের পথ এবার জলধর মালাকারের বাড়ীর উপর দিয়া। উঠানের অর্দ্ধেকই উধাও। খালি পড়িয়া আছে দু'খানি ভিটা, আর হোগলাপাতার পুরানো রান্নাঘরটা। কড়ি বরগা, চাল-বেড়া, হাঁড়িকুড়ি —সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া জলধর কোন কূলে কোন্ গ্রামে আবার নূতন করিয়া ঘর বাঁধিল সে খবর সুনীল এখনো জানে না। শতখণ্ড উনানের পোড়া কালো শক্ত ঢেলাগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো,একরাশ ছাই দিন কয়েক আগেকার এক প্রাত্যহিক জীবনের শেষ পরিচয় রাখিয়া দিয়াছে। উঠানটুকুর মাঝামাঝি মস্ত এক ফাটল! সামনের একটা হেলিয়া-পড়া সুদীর্ঘ নারিকেল গাছ কচি ডাবের গোটা তিনেক পিড় লইয়া নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেও ঝির ঝির করিয়া পাতা নাড়ে অশ্রান্ত।

ফেলিয়া-আসা জীবনের অনেক কথা মনে পড়ে সুনীলের। খানিক দূরে ঐ যে ঘোলা জলের পাকে-পাকে কচুরিপানার একটা মস্ত চাক ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অসহ্য তোড়ের টানে—ওখানেই বুঝি সেই খেলার মাঠটা? ছোট বেলায় পাকড়াশীদের বাগানের বাতাবিনেবু চুরি করিয়া সেই না প্রথম ফুটবল খেলায় হাতে-খড়ি। দাঁড়ি বাঁধা, হাডুডু, কানামাছি, বৌ ছোঁওয়া, ঘর-চান-বাহির-চান—কত দিনের কত রকমের খেলা। ঐ খেলার মাঠটা পার হইলেই উমেদপুর খালের উপর কাঠের পুল—খেলায় হারিয়া দক্ষিণহাটির হাই স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে সে-বার সে কি হাতাহাতি কুরুক্ষেত্র!—ঐ যে দূরে পাক-খাওয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ঢেউগুলির উপর কাঁচা রোদ পিছলাইয়া পড়িয়া চোখ ধাঁধায়—সেখানে, না আর একটু সামনে, না আর একটু দূরে?—ডাইনে, না বাঁয়ে?—-—ঐ যে একটা দশমাল্লা

নৌকা বাদাম ফুলাইয়া উজান ঠেলিয়া চলিয়াছে, সেইখানেই বুঝি হালদারপাড়ার তাল-ভিটা ? একবার নষ্টচন্দ্রে পোদ্দার-বাড়ীর নারকেল গাছ হইতে পিড়শুদ্ধ ডাব পাড়িয়া লইয়া বীনু আসিয়া ঘুরঘুটি অন্ধকারে ঐখানেই না সখের চোরদের কাছে তাহার অসম-সাহসিকতার কাহিনীটা বিবৃত করিয়াছিল একনিঃশ্বাসে ?—

খানিক দূরে আর একটা বড় গোছের জলীয় আক্রোশ চক্রাকারে ঘুরিতেছে—তারই এদিকে বা ওদিকে অথবা ঠিক ওখানটায়ইকি জমিরুদ্দীন খাঁ একবার হালদারদের পড়োদালান থেকে দুই দুইটি গোখরো ধরিয়াছিল ? পাঁচনলা ট্যাটার-ফোঁড়া বিষধর-দম্পতির জোড়া-মৃত্যু দেখিতে সারাগ্রামের লোক সেদিন ভাঙ্গিয়া পড়িল হালদারদের উঠানে। এখনো স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু ওখানেই তো ? হয় তো বা, হয় তো না। উন্মত্ত নদীবক্ষে ডাঙার অবস্থান আজ নির্ণয় করিবে কে ?

নিকারীপাড়ার খানকয়েক খড়ের চালা দেখা যায়। আরো কাছে জেলে পাড়াটা। কয়েক ঘর এবার নূতন আসিয়া 'পাতনা' দিয়াছে। গ্রামের জনসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইল যা হক্।

এদিকে সুনীলদের পুকুর পাড়ে তখন এক মজার খেলা। নীলু, বাবলু, টুলু, পাঁচু—কামারবাড়ীর আরো জনকয়েক ছেলে মেয়ে কুলগাছের তলায় 'মিনি মিনি' খেলিতেছে। নীলুর হাতে একটা সাপলা ফুল—ডাঁট খুলিয়া ফেলিয়া ফিতার মত লম্বা ছাল দিয়া ফুলটাকে প্যাচে প্যাচে জড়াইয়া নিয়া নীলু করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আর সকলে সমস্বরে সুর করিয়া দেয় জবাবের পর জবাব।

নীলু গায়, "আমাদের বাড়ীর 'মিনি' তোমাদের বাড়ী গেছে ?"

"গেছে ?"

"কী করে ?"

"রাজার পাতে দুধভাত খেয়ে

আখার পিঠে আছে শুয়ে ।"

"ডাক দিলে তো আসবে ?"

"আসবে।"

"তবে আয় মিনি মিনি মিনি-ই-ই......" বলিতে বলিতে নীলু কাঁটিমের মত সাপলা ফুলের বন্ধন ছাড়িয়া দেয়। সবগুলি দল মেলিয়া সাপলা ফুলটা মিনির ডাক শুনিতে শুনিতে মাটিতে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে পায়ের কাছে। অপর পক্ষ একসঙ্গে হর্ষ-ধ্বনি করিয়া ওঠে।

পাড়া-বেড়ানো কোন বিড়ালের কানে সে ডাক পৌঁছায় কিনা জানিবার প্রয়োজন নাই। মিনি নামক চিরদিনের এক বিড়ালকে উপলক্ষ্য করিয়া এমন খেলা সুনীলরাও কত খেলিয়াছে। আজ সে-মন আর সে-বয়স পার হইয়া আসিয়াছে বহুদূর।

নীলু আবার ডাকে—মিনি মিনি ?—

সাপলা-রাণীর শুভ্র হাসি। সাদা ধবধবে দলগুলি মেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিশু মনে নাচিয়া বেড়ায়—সুনীলের শৈশব মনে !

দাদাকে দেখিয়াই ছোট ভাই বাবলু খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া কাছে আসে "দাদা, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?"

"নদীর পাড়ে ?"

"আমায় নিয়ে যাও নি কেন ?"

সুনীল পাঁচ বছরের ছোট ভাইটিকে কোলে তুলিয়া নেয়, "তুমি তো তখন ঘুমুচ্ছিলে।"

"তুমি দুগ্‌গা দেখেছো ?"

"হ্যাঁ।"

"কলা বৌ ?"

সুনীল ভাইকে পুকুর ঘাটে বসাইয়া পায়ের কাদা ধুইতে থাকে।

"দাদা, তোমার বিয়ে ?"

"কে বললে ?"

"হ্যাঁ, ঠাকুদ্দা বলেছে, মা বলেছে—তোমার কলা-বৌর মতো ঘোমটা-পরা বৌ হবে।"

পাড়ে দাঁড়াইয়া নীলু ও আর সব খেলার সাথীরা হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

ঠাকুরদা বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষন কোথায় ছিলি বাদল ?"

"নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলুম —মালাকাররা কোথায় গেল ?"

"তারা ওপারে জাজিরার চরে চলে গেছে।"

ঠাকুরদা বসিয়া আছেন জল চৌকির উপর। সুনীল ঘর হইতে বেতের চেয়ারটা আনিয়া বাবলুকে কোলে লইয়া তাহার মুখোমুখী বসে।

মন্দাকিনী এক রাশ বাসন লইয়া খিড়কির পুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

"খোকা তুই এতক্ষন কোথায় ছিলি ? অনু এসেছিল। আমি

ভাবলাম, তুই বুঝি ওদের ওখানে গিয়েছিস।" বলিতে বলিতে মন্দাকিনী এ-ঘরের বারান্দার কাছে আসিয়া দাঁড়ান। তারপর মুচ্‌কি হাসিয়া শ্বশুরকে কহিলেন, "বাবা, এবার তোমার নাতির সঙ্গে কথাটা পাকা পোক্তা করে নাও।"

সুনীল মায়ের দিকে চাহিয়া হাসে। ব্রজনাথ দত্ত তামাক টানিতে টানিতে একটু কাশিয়া লইয়া ভূমিকা সুরু করেন, "বাদল, আমি আর বেশি দিন নেই। তোর বাবা মরার পর আমার যে শরীর ভেঙ্গে গেছে তা আর সারলো না—তোর যদি না—"

"ঠাকুরদা, তুমি কী বলতে চাও তা জানি। এখন নয়। আমায় আরো দু' বছরের সময় দাও।"

"আমি কি আর অদ্দিন থাকব রে? —আমার সেই বুকের ব্যথাটা আবার দেখা দিয়েছে!"

"পুজোটা যাক। আমি তোমায় সব কথা বুঝিয়ে বলব।"

"সেটি হচ্ছে না। এবার তোমার কোনো আপত্তি আমরা শুনব না" বলিয়া মন্দাকিনী শ্বশুরের দিকে চাহিলেন। ব্রজনাথ পুত্রবধূর অর্থপূর্ণ ইসারা লক্ষ্য করিয়াই কহিলেন, "তুই আগে মেয়েটি দেখে আয়।—পছন্দ না হ'লে তো কোনো কথা নেই।"

সুনীল জবাব দেয় না। কোলে বসিয়া বাবলুও বায়না ধরে, "হ্যাঁ, দাদা! তুমি বিয়ে করবে—আজই।" মৌন আবেদন লইয়া নীলুও আসিয়া চেয়ারের কাছে দাদার পাশ ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়।

মন্দাকিনী হাসিলেন, "উত্তর দিচ্ছিস না যে? অমন বোবা হয়ে থাকলেই ছাড়ছি নে।" সঙ্গে সঙ্গে ব্রজনাথও নাতিকে রহস্য করিয়া

কহিলেন, "বিয়ে করবি কি শেষকালে চুলদাড়ি পাকিয়ে একটা বুড়োধাড়ী মেয়েকে ?"

বাবলু দাদার কোল ছাড়িয়া এবার ঠাকুরদার কোল জুড়িয়া গিয়া বসে। দাদার পক্ষে থাকা এখন সুবিধাজনক নয়। এ-পক্ষ থেকে ঠাকুরদার রসিকতার অনুকরণ করিয়া ও-পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়োধাড়ী বিয়ে করবে ?"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। নীলু ছোট ভাইকে শাসন করে—"দাদার সঙ্গে বুঝি ইয়ারকি দেয় !—পাজি ছেলে কোথাকার !"

সুনীল চুপ করিয়া হাসিতেছে। মন্দাকিনী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। শ্বশুরকে দিয়া তার বড় নাতির কাছ থেকে পাকা কথাটা তিনি আদায় করিয়া লইতে চান আজই। ব্রজনাথও হুঁকায় একটা টান দিয়া আবার কথা পাড়িবেন, এমন সময় ছোট নাতি ঠাকুরদাকেই প্রশ্ন করিয়া বসে, "ঠাকুরদা, তুমি বিয়ে করবে না ?"

"না।"

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। উৎসাহ পাইয়া নাতি আবার প্রশ্ন করে, "তুমি কাকে বিয়ে করবে ঠাকুরদা ?"

"আমার আর চিন্তা কি রে দাদু ! কনে তো ঘরেই আছে—আমি না তোর দিদিকেই বিয়ে করব।" বলিয়া ব্রজনাথ নাতিনীর দিকে মুচ্‌কি হাসিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, "কি গো ঠাক্‌রুণ, পছন্দ হয় ?"

নীলু মুখ ভ্যাঙচাইয়া কহিল, "যাঃ অসভ্য।"

মন্দাকিনী রুখিয়া উঠিলেন, "ছাখ, পাজি মেয়ে—যা মুখে আসবে তাই বলবি।"

নীলু মারের ভয়ে দৌড়িয়া ঠাকুরদার পিছনে গিয়া আশ্রয় লয়। ব্রজনাথ তাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আমাদের দাদা-নাতনির কথার মধ্যে থাকো কেন বলো তো, বৌমা ?"

বাবলু এদিকে নীলুকে কিছুতেই ঠাকুরদার কোলে বসিতে দিবে না। তার যেন এটা একচেটে অধিকার। দু'জনের ঠেলাঠেলিতে ঠাকুরদা অতিষ্ঠ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আঃ ও-রকম করিস্ নে কলকের আগুন পড়ে গিয়ে শেষকালে পুড়ে মরব।"

বাবলু ঠাণ্ডা হইয়া প্রশ্ন করিল, "আগুন ধরলে কী হয় ঠাকুর্দা ?"

"হবে আবার কী ! আমরা সব পুড়ে মরব।"

"আর কে মরবে ?"

"সবাই—বাড়ী ঘর-দোর সব।"

"আমাদের নারকেল গাছটা ?"

"হ্যাঁ রে"।

"পুকুরটা ?"

ঠাকুরদা হাসিয়া উঠিলেন, "জলে কখনো আগুন ধরে ?" বাবলু এবার চুপ করিল। নীলু ছাড়িবার পাত্রী নয়, তাহার বয়স বেশি কহিল, "ধরো না ঠাকুর্দা, জলে যেন আগুন লাগে-ই।"

"লাগে তো লাগবে।"

"মাছগুলো সব যাবে কোথায় ?"

"কেন, পাঁকের মধ্যে লুকোবে।"

"পাঁকেও যদি আগুন ধরে ?"

"যাবে তখন পুকুরপারের বাঁশ-ঝাড়ে।"

"সেখানেও আগুন ধরে যায় যদি।"

"যাবে তোর শ্বাশুড়ীর কাছে—আর পারি নে বাবা!" বলিয়া ঠাকুরদা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। সুনীল নিশ্চিন্ত হয়। এই সুযোগে আসল প্রসঙ্গটা চাপা পড়িয়াছে যাহা হউক্।

দত্ত বাড়ী ঢাক বাজিয়া উঠিল। নীলু ও বাবলু নাচিয়া ওঠে, "চলো ঠাকুর্দ্দা, দেখব—পূজোয় বসেছে।"

"না-রে, এখনো অনেক দেরী।"

"হ্যাঁ, এখনি। তুমি কিচ্ছু জানো না ঠাকুর্দ্দা। চলো!" বাবলু ঠাকুরদার কোঁচার খুঁট ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে।

ব্রজনাথ নাতি ও নাতিনীকে লইয়া পূজা বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়ান। মন্দাকিনী ডাকিলেন, "তুমি যে চলে যাচ্ছ বাবা! নাতি তো জবাবই দিলে না।"

"ভেবো না, বৌমা। বিয়ে কি ওর ইচ্ছের উপর? বি-এ এম-এ পাশ করেছে বলে কি বিয়ের কর্ত্তা ও নিজে? আমরা যা ঠিক করব ওকে তা মানতেই হবে," বলিয়া সহাস্যে সুনীলের দিকে চাহিয়া নাছোড়বান্দা নীলু ও বাবলুকে লইয়া পূজা বাড়ীর দিকে চলিলেন।

মন্দাকিনী কাজ অর্দ্ধেক নিষ্পন্ন হইয়াছে ধরিয়া লইয়া হাসিমুখে গৃহকাজে চলিয়া যান।

সুনীল চেয়ারখানি একটু ঘুরাইয়া বসে বরাবর পদ্মার দিকে মুখ করিয়া। ভালো লাগে এই সর্ব্বনাশা নদীকে। জীবনের মতই অব্যাহত গতি—যৌবনের মতই অনিবার্য্য। চলে আর ভাঙ্গে।

জয়ের পর জয়, তবু মাটির মায়ার ক্ষয় নাই। নূতন করিয়া আবার চর জাগে এখানে-ওখানে। লাঠালাঠি লাগে জমিদারে-জমিদারে। সাব্যস্ত হয় মালিকানা। দেখিতে দেখিতে তৃণগুল্ম লতাপাতায় বালুর চর ঢাকা পড়ে। ধীরে ধীরে দেখা দেয় ঘর-বাড়ী, লোকজন, গরু-বাছুর—আবার কূলে কূলে প্রত্যহিক জীবনযাত্রা। তবু রাক্ষসী পদ্মা!…

নমিতা চিঠি লিখিতে অনুরোধ জানাইয়াছে। শিলং মেলে তারা বেশি দূরে যায় নাই—পাবনায়। সেখান থেকে যাইবে ঢাকায়। নবমী পূজা কি দশহরার মধ্যেই তাদের ঢাকা পৌঁছিবার কথা। নমিতার মামাবাড়ী সেখানে। মা বাঁচিয়া থাকিতে একবার মামাবাড়ী গিয়াছিল ছোটবেলায়। এবার বহুকাল পরে আবার পদ্মা পাড়ি দিল। সুনীল তাদের সব খবরই রাখে। দোষ কি! সুনীল তো আর গণৎকার নয়। নমিতা ঘরোয়া কথা সব বলে কেন অপরের কাছে?… নমিতা চিঠি দিতে বলিয়াছে ঢাকার ঠিকানায়। সুনীলের ঠিকানাও চাহিয়া রাখিয়াছে—বিজয়ার প্রীতি নমস্কার জানাইবে বুঝি? বিজয়ার আর বাকি ক'দিন?

"খোকা!" মন্দাকিনী একবাটি দুধ আর গোটা কয়েক নাড় মোয়া লইয়া আসিয়াছেন।

"এত খাব না মা"

"পূজো বাড়ীর নেমতন্ন—খেতে খেতে সন্ধ্যে হবে। পাতে কিছু রাখিস্ নি কিন্তু।—সব খেতে হবে," বলিয়া মন্দাকিনী আবার গৃহকাজে চলিয়া যান।

সুনীল কত কি সব ভাবিতে ভাবিতে খাইতেছে। হুঁস নাই কখন

পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অণিমা।

"ওকি বাদলদা'! অঞ্জলি না দিয়েই খাচ্ছেন যে?"

"অনু এসেছিস?—মাটিতে কেন? ঐ জলচৌকির ওপর বস্ না।—ভারী লজ্জা! চৌকিটায় বসলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে?"

অণিমা মাটিতেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, "অঞ্জলি না দিয়েই খেলেন!"

সুনীল অণিমার মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত শুধু তাকাইয়া থাকে। কাল অপরাহ্ণে ঘরের মধ্যে আব্ছা আলোয় অণিমাকে এতখানি স্পষ্ট করিয়া দেখে নাই। ওদের বাড়ীতেও পুরান লণ্ঠনের ঝাপসা আলোতে তার চোখে ওর বয়সটাই শুধু বেশি করিয়া ঠেকিয়াছে। আজ সকালে দিনের আলোতে অণিমা যেন আর কেহ। আশ্চর্য্য! ও যে কোনদিন এত সুন্দর হইতে পারে আট বছর আগে সে-কথা একবার মনেও জাগে নাই কেন?

সুনীল পাণ্টা প্রশ্ন করিল, "খেয়ে অঞ্জলি দেওয়া চলবে-ই না?"

"না।"

"বেঁচে গেলাম।"

"আপনি বুঝি আর ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করেন না?"

"ঠাকুর-দেবতার কথা ভাববার সময় কৈ?"

মুচকি হাসিয়া অণিমা কহিল, "তবে কী ভাববার সময় আছে?"

"মানুষের ভাবনার যেন অন্ত আছে!"

অণিমা ছোট্ট একটি "হুঁ" করিয়া হাসিতে থাকে।

মন্দাকিনী পুত্রের জন্য চা লইয়া আসিয়াছেন। অণিমা কহিল,

"বড়মা, তুমি তো বেশ! ছেলেকে অঞ্জলি দেবার আগেই খেতে দিলে? ছেলেই না হয় কিছু মানে-টানে না, তুমি দিলে কেমন করে?"

মন্দাকিনী সহাস্যে কহিলেন, "আজ চার বছর হ'ল ওর কী যে মতিগতি হয়েছে, কোনো কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই!—ওর ঠাকুর্দাই অত ক'রে বুঝিয়ে পারলে না, আর আমি।"

মন্দাকিনী চা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। অণিমা মুখেচোখে হাসি গোপন করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া কহে, "বাদলদা, নমিতার বুঝি এ-সবে বিশ্বাস নেই?"

—"এর মধ্যে হঠাৎ নমিতা কেন?"

"এমনি," অণিমা আর এক ঝলক হাসি চাপিয়া যায়।

"তুই যেমনি করে 'এমনি' বললি, ওর মানেটা কিন্তু তত সহজ নয়।"

অণিমা তেমনি চুপ করিয়া হাসিতে থাকে শুধু।

"তুই যা ভাবছিস্ অনু তা নয়।"

"কী ভাবছি আমি?" অণিমা বিস্ময়ের ভাণ করে।

"তুই ভারী দুষ্টু হয়ে গেছিস অনু। কী কুক্ষণে মুখ দিয়ে কাল কথাটা বার হয়ে পড়ে এখন তোর ফাঁদে পড়ে গেছি আর কি।"

"তবে না বললেন, তুই যা ভাবছিস তা নয়। ঠাকুর ঘরে কে, কলা খাই নে," বলিয়া অণিমা হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। চমৎকার! এলোচুল পিট ছাইয়া মাটি ছুঁইয়া পড়িয়াছে। খানিক আগেই স্নান

সারিয়াছে। শিশির-ধোওয়া এক পুষ্পিত শাখার মত অণিমারাণী টিনের বেড়া ঠেস দিয়া তির্য্যক ভঙ্গিতে বসিয়া আছে। গায়ের রং উজ্জ্বল-শ্যাম। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। মানানসই লম্বা। হাস্যে-লাস্যে আজিকার উজ্জ্বল প্রভাতখানির মতই সহজ ও স্বাভাবিক। সুনীল ঐ মুখখানির উপর এক বিমুগ্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কথার জবাব দিতে ভুলিয়াই যায়।

এমন আপন জনের সঙ্গে এত সহজ আলাপের মাঝখানে বাদলদার অমন করিয়া চাহিয়া থাকার অর্থ কি? অণিমার মুখে চোখে লজ্জার পাতলা পরদা কেবলি পিছলাইয়া মিলাইয়া যায়। নীরবে পায়ের বুড়ো-আঙ্গুলের নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে থাকে আনতমুখে।

"অনু!"

অণিমা মুখ তুলিল। তুলিল সেই সুন্দর চোখ দুটি। সুনীল আবার এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া লয় পাকা সমঝদারের দৃষ্টিতে।

"তুই ভুল বুঝেছিস, অনু!..."

অণিমা তেমনি নির্ব্বাক। হঠাৎ-আসা লজ্জার রেশটুকু কাটে নাই এখনো।

"সত্যি কথা বলব তোকে। তবে শোন—ওকি লজ্জা পাচ্ছিস কেন?"

"বলুন।"

"মেয়েটিকে ভালো লাগে—কিন্তু ভালো বাসি নে।"

অণিমা মুখ ফিরাইয়া উত্তর দেয়, "একই কথা।"

"না এক কথা নয়।"

তর্কের সুযোগ পাইয়া অণিমা আবার আগের মত সহজ হইয়া ওঠে; মৃদু হাসিয়া কহিল, "প্রথমটায় তা-ই মনে হয় বটে।"

"তুই যে অভিজ্ঞের মতো কথা বলছিস রে।" সুনীল মনে মনে হাসে—বড় পাকা মেয়ে! কহিল, "তাই যদি হয়, তুই জানলি কী করে?"

অণিমা লজ্জা পাইয়া চুপ করিয়া যায়। সুনীল অকারণেই একটু কাশিয়া লইয়া বলিতে লাগিল, "বিশ্বাস কর অনু! নমিতাকে আমি—ভালোবাসা-টাসা বলতে যা মনে করিস সে সব কিছু নয়।"

একথার জবাব অণিমার মনেই রহিল—মুখে বলিবার সীমানা যে পার হইয়া আসিয়াছেন সুনীলদা। কি কথায় কি সব অর্থ করিয়া অণিমাকে খামকা বিব্রত করাই তার মতলব। অজানিতে সামনের দু'গাছা উড়ো-উড়ো চুল আঙুলে জড়াইয়া আবার খুলিয়া ফেলে অণিমা। একবার মুখখানি একটু তুলিয়া লইয়া আবার নামাইয়া বাদলদার কথাগুলির কতক শোনে, কতক নয়।

সুনীলের কথায় বাধা দিয়া আনমনা অণিমা হঠাৎ প্রশ্ন করে, "বাদলদা, নমিতা খুব সুন্দরী?"

সুনীল তার শ্রোত্রীর অমনোযোগ টের পায়। অণিমাকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া আপাদশির দেখিয়া লইয়া উত্তর দিল, "খুব কালো।"

"মিছে কথা।"

"তা হ'লে দুধে-আলতা রঙ্।"

"না-না, সত্যি করে বলুন।"

"সত্যি বল্‌ছি—নমিতা মার চেয়েও কালো।

"আমার মতো?"

সুনীল হাসিয়া উঠিল, "তুই আর তেমন কালো কৈ রে।"

অণিমা সহাস্য বিস্ময়ে কহিল, "ও মা! আমি নাকি ফর্সা।—বাদলদা, আপনার চোখ খারাপ হয়েছে। এবার ক'লকাতা গিয়ে চশমা নেবেন।"

সুনীল একদৃষ্টে অণিমার দিকে চাহিয়াই আছে।

"নমিতা গান গাইতে জানে?"

"হ্যাঁ। বেশ গায়।—রেকর্ডেও গান দিয়েছে।"

"আপনি কখন্ পড়াইতে যান?"

"সন্ধ্যের পর।—তোর অত সব প্রশ্ন কেন অনু? স্পষ্ট জবাব তো আগেই দিয়েছি। তবু যদি মিথ্যেই বলে থাকি, অত জিজ্ঞাসাবাদে কি আর সত্য কথা বার হবে?"

অণিমা হাসিয়া ওঠে, "সে তো জানি। এ-কথাটা আগে বললেই তো ফুরিয়ে যেত।—আমি এবার যাই, বাদলদা। অনেকক্ষণ এসেছি। মা বুঝি রাগ করছে। এক রাজ্যের জামা-কাপড় কাচব বলে ফেলে রেখে' এসেছি যে।"

"যাচ্ছিস অনু?"

"তবে কি এখানে বসে আপনার সঙ্গে খালি বক্‌বক্ করব! আমার বুঝি আর কাজ-কম্ম নেই?" বলিয়াই অণিমা সুনীলের সন্ধানী দৃষ্টির

সম্মুখে লজ্জা বাঁচাইতে সরিয়া-যাওয়া আঁচলটা বুকের উপর টানিয়া লয়। কিন্তু আর একটা লজ্জা হঠাৎ সুনীলের চোখে আসিয়া যেন ধাক্কা খাইয়া পড়ে। অণিমার পুরানো সেমিজটা সস্তা ছিটের, হাতে তৈরী, ছেঁড়া —কণ্ঠা থেকে কাঁধ অবধি ভিন্ন রঙের এক টুক্‌রা কাপড়ে সরু করিয়া একটা লম্বা তালি। এই পূজার দিনে অণিমার পরণে আধময়লা পুরাণো শাড়ি! নরেশ কাকা তাঁর মেয়েকে একখানা বঙ্গলক্ষ্মীর আটপৌরে কাপড়ও কি কিনিয়া দিতে পারেন নাই? হতভাগা!

সুনীল পিছু ডাকে "অনু, কথা শোন।"

অণিমা ফিরিয়া দাঁড়ায়। কথাটা শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

একটা কিছু বলিতেই হইবে। কি-ই বা বলা যায়! উঠানের উপর ক্রীড়ারত বিড়ালের বাচ্চাটাকে দেখাইয়া সুনীল কহিল, "ছাখ অনু, বাচ্চাটা কেমন খেলছে।"

"এরি জন্যে আমায় পিছু ডাকা?

"ও বুঝি আর দেখবার মতো নয়? কেমন আপন মনে খেল্‌ছে। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। জামাকাপড়ের বালাই নেই। টাকা কড়ির হিসেব রাখতে হয় না। নিশ্চিন্তে ধুলোকাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছে!"

"আপনার কাব্যি শুনবার সময় আমার নেই।" বলিয়া অণিমা হাসিয়া উঠিল। স্বচ্ছ সহজ হাসি। হরিদ্বারের গঙ্গার মত মনের তল অবধি যেন দেখা যায়। ওখানে তো ছেঁড়া সেমিজের প্রশ্ন নাই!

বাদলদার অমন আকস্মিক ভাবান্তর অণিমার কাছে কেমন-কেমন মনে হয় বড়। আবহাওয়াটা বদলানো দরকার। হাসিয়া কহিল, "বাদলদা, পুষির সাদা বাচ্চাটা আমরা

নিয়েছি। হরিণ রঙের বাচ্চাটাই সব চেয়ে ভালো ছিল দেখতে। দত্তবাড়ীর ছোট হিস্তের খুড়িমা সেটা চেয়ে নিয়েছেন। ঐটুকুন তো বাচ্চা—তবু রাগ হ'লে লেজ ফোলায় কী চমৎকার!”

সহজ তুচ্ছ কথা!—নমিতার মত এক প্রসঙ্গ থেকে আর এক প্রসঙ্গে সিরিয়স্ হইবার ভাণ করিতে জানে না। মনের সেই সম্পদ্ অণিমার নাই। তবু ভাল লাগে—বড় ভাল লাগে শুধু হালিকা মনে শুনিয়া যাইতে।

“আমাদের পেনুর কিত্তি শুনবেন, বাদলদা?”

“পেনু কে?”

“পুষির মেজো-বাচ্চা গো—আমরা যেটা নিয়েছি। সেদিন কী কাণ্ডটাই না করলে! আমি গেছি পুকুরঘাটে, মা তখন ঢেঁকিঘরে। বলু আর টুলুও বাড়ি নেই। ঘরে ফিরে দেখি কী! আপনাদের পুষি কখন এসে রান্নাঘরে ঢুকে দুধের কড়াই থেকে—” অণিমা যেন কত বড় এক রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনাইতেছে এমনি ভাবেই বলিয়া চলিল, “দেখি কি বাদলদা, মা-ছেলেতে দুধের ভাগ নিয়ে তুমুল ঝগড়া!'

“তারপর?”

“তারপর বাদলদা, বললে বিশ্বেস করবেন না, একরত্তি বাচ্চাটা তার মাকে খিমছে কামড়ে আর রাখলে না। পুষি কিন্তু একটিবার শুধু থাবা দেখিয়ে আস্তে আস্তে বার হয়ে গেল।”

“পুষি কিচ্ছু বললে না?”

“শুনুন। এখনো শেষ হয় নি। তার দু'তিন দিন পরেই বাবার পাতের কাছে কাঁটা খাচ্ছিল পেনু আর কামারদের একটা কালো বাচ্চা।

দুটিতে বড় ভাব। আমাদের চৌকির নিচে ওরা রাতদিন খেলা করে। পুষি চৌকাঠের মধ্যে ঘাড় গলিয়েই রেগেমেগে গা ফুলিয়ে তেড়ে এল। তারপর কামারদের বাচ্চাটাকে কামড়ে খিমচে ভাগিয়ে দিলে। নিজে কিন্তু মাছের কাঁটা ছুঁলও না একবার। ছেলেকে দিয়ে বাইরে এসে মিউ মিউ করে চলে গেল। দেখুন তো, ছেলের জন্য মার কী দরদ!”

“কামারদের বেড়ালটা বুঝি মাদি?’

‘হুঁ’

“তাই বল্।’

সুনীল ও অণিমার এই সরস সংলাপ আরো কতক্ষণ গড়াইয়া চলিত বলা যায় না, কিন্তু টুলু আসিয়া পিছন হইতে তার দিদিকে শাসাইতে থাকে, “মা তোমায় বকছে। মজা দেখাবে’খন আজ। তুমি কাপড়গুলো উঠোনে ফেলে রেখে সেই কখন এসেছ, আর বাড়ী ফেরবার নামটি নেই।’

অণিমা সুনীলের দিকে চাহিয়া অনুযোগের সুরে কহিল, “দেখুন দিকিনি, আপনি খালি খালি আমায় দেরি করিয়ে দিলেন।”

“কাকীমাকে বলিস্, আমি সন্ধ্যের পর যাব।”

অণিমা চলিয়া গিয়াছে বহুক্ষণ। তার ছেঁড়া সেমিজটা সত্যই বড় বিশ্রী ঠেকে এখনো। অণিমাকে তার ভাল লাগে বলিয়াই কি হঠাৎ এই ভাল-মন্দের প্রশ্ন? বেশ তো! এতে অন্যায়টা কোথায়!

কিন্তু···বকুলতলার মনখানি যে কলিকাতার মনের নাগাল পায় না।...না পাক্। আপাততঃ বড় কথা, সব

কুৎসীৎ অসহ্য ব্যাপার. অনিমার ঐ ছেঁড়া সেমিজ। সহসা নমিতা সেনের কতদিনের কত না ছাঁদ সুনীলের মনের চোখে জাগে। নিত্য-নতুন শাড়িব্লাউজ বদলায় সে। সেই যে জন্মদিনে নমিতা একটা ফিকে-গোলাপী ব্লাউজের উপর সিগারেটের ধোঁয়া রঙের একখানি ভাগলপুরী সিল্ক পরিয়াছিল—অনিমার উজ্জ্বলশ্যাম কণ্ঠাস্থি থেকে কাঁধ অবধি, গলা থেকে গোড়ালি পর্য্যন্ত, সেই শাড়ি আর সেই ব্লাউজ অনিমাকেই মানায় ভাল—আরো চমৎকার!...

অনিমার আজই একখানি নতুন শাড়ি চাই। আর চাই একটি রঙীন ব্লাউজ বা সাদা সেমিজ। কি বিদকুটে জোড়াতালি! অনিমাকে পূজায় কাপড় দিবার তার অধিকার আছে—ন'কাকীমা গ্রাম সম্পর্কে শুধু কাকীমাই নন, তিনি নাকি ছোটবেলায় সুনীলকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। অনিমাকে একটা ব্লাউজ কিনিয়া দিবার ক্ষমতা আছে তার।...হঠাৎ আবার নন্দ দাস!...সুন্দর বৌদি, ছবি ও টেপি। তাদের সঙ্গে বুঝি অনিমার তুলনা? অনিমা শুধু অনিমা। অনিমাকে তার ভালো লাগে! ব্যস! এখানে করুণার প্রশ্ন নাই। ঔচিত্যের কৈফিয়ৎ নাই। বিচার-বিবেচনার ঝঞ্ঝাট নাই। নন্দদাস তো নন্দদাসই —কষ্টে আছে চিরকালই, তেমনি থাকুক। তার অভাব সুনীল যত মনে করে, আসলে তা নয়: কোনরকমে সহিয়া মানিয়া নির্ব্বিবাদে নন্দদাস বেশ আছে।...

একদিন আর এক সকালের মধ্যেই নমিতা সেনের চোখের কাছে ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া অনিমার হাসি মেলায়।...অনিমা যদি নমিতা হইত কিংবা নমিতাই অনিমা—অথবা খানিক নমিতার সঙ্গে

খানিক অণিমা। সুনীলের এই সংমিশ্রণের ফলাফল যাহাই হউক না কেন, ছেঁড়া সেমিজটা কেবলি রসভঙ্গ করে।…এমন সময় মন্দাকিনী আসিয়া ছেলের মাথায় হাত রাখিলেন।

"খোকা, আবার তো জিগগেস করতে ভয় করে আমার। ফোঁস করে উঠ্‌বি! খালি খালি ভাবছিস্ কী এত?"

সুনীল মার একখানি হাত কোলে টানিয়া নিয়া হাসিয়া কহিল, "পদ্মার দিকে চেয়ে এমনি বসে বসে ভাবতে আমার বড় ভালো লাগে মা।"

"নাইতে যা।—বেলা বুঝি কম হয়েছে!"

"যাচ্ছি," সুনীল মার ডান হাতখানি তুলিয়া নেয় মাথার উপর, "মা, অনুর মার কাছে কাল অনেক কথাই শুনলাম। ওদের তো বড় কষ্ট।"

"কষ্ট বলে কষ্ট! ন'ঠাকুর যদি অবুঝ না হ'ত তবে এত দুখখু পেতে হয় না। অনুটার জন্যে কষ্ট হয় বড়।—অমন লক্ষ্মী মেয়ে!"

"ওর বিয়ের কোনো চেষ্টা করছে না কেন?"

"টাকা কোথায় সম্বলের মধ্যে তো ঐ একখানা চোচালা ঘর। রেহান দিয়ে আর কতোই বা পাবে।—ন'ঠাকুরের গুমর দেখে গা জ্বালা করে। বলে, মেয়েকে যার তার হাতে ধরে দিতে পারব না। মালখানগর থেকে এক সম্বন্ধ এল। অবস্থা খুবই ভালো। দোজবর হলেও বয়েস বেশি নয়। ন'ঠাকুরের মন উঠ্‌লো না। পয়সা যখন নেই, তখন অত বাছবিচার করলে কি আর মেয়ের বিয়ে হয়!"

"অনুর পরণে আজ পুজোর দিনে নতুন কাপড় দেখলাম না তো।"

"ছোট ছেলে-মেয়ে তিনটেকে কোন রকমে একখানা ক'রে কাপড় কিনে দিয়েছে। টাকা কোথায়? ছাত্র পড়িয়ে ন'ঠাকুর পান সাত টাকা। স্নুলুও ইস্কুল থেকে পঁচিশ-ত্রিশ সেরের বেশি চাল পায় না।"

"মা, ন'কাকীমা কাল বলছিলেন, তিনি নাকি ছোট সময় আমায় রাতদিন কোলে-পিঠে করতেন।"

"তোকে খুব ভালো বাসত স্নুলু। তখনো তো ওর কোন ছেলে পেলে হয়নি।"

"আচ্ছা, মা, তা হ'লে ন'কাকা ন'কাকীমা আর অনুকে—অবশ্য তুমি যদি বলো"—একটু কাশিয়া লইয়া পুত্র কহিল, "পূজোয় একখানা ক'রে কাপড় কিনে দিলে কি সেটা খারাপ দেখাবে?"

"খারাপ আর কী দেখাবে এতে।"

"তবে তিনখানা কাপড় দিতে তুমি না পারো এমন নয়।"

"বেশ তো।—তোর ঠাকুর্দা যেন টের না পান। তাঁর বয়েস হচ্ছে, আর দিনের দিন কেমন খিটখিটে হয়ে পড়ছেন। তাঁর সন্দেহ, আমি নাকি ওদের চাল-ডাল ধার দিই। মাসের শেষে কিছু আনতে বললেই বলেন, এরি মধ্যে কী করে ফুরিয়ে গেল?"

"তা হ'লে আজই ওদের কাপড় কিনে দিই?"

"বেশ তো," মন্দাকিনী আনন্দের সহিতই ছেলের প্রস্তাবে সম্মত হন। অণিমাদের উপকার করা হইবে সে-কথাটা তাঁর কাছে বোধ হয় খুব বড় কিছু নয়, তাঁর গর্ব্ব চাকুরে ছেলের মা তিনি।—দুচার জোড়া কাপড় দিয়া আত্মীয়স্বজন মহলে নিজেকে জাহির করিবার একটা সুযোগ তিনি পাইলেন।

"তবে আমি নেয়ে উঠে বাজার থেকে কাপড় নিয়ে আসি?—দত্তবাড়ী নেমন্তন্নের তো এখনো তিন-চার ঘণ্টা বাকি।"

"না-না, এ দুপুর বেলা না খেয়ে অদ্দুর যেতে পারবি নে। কাল দিলেও হবে।"

"আচ্ছা, সন্ধ্যের পর উমেদপুর মনসাবাড়ীর প্রতিমা দেখতে তো যাবই, তখন আসবার পথে কিনে নিয়ে আসব'খন।"

মন্দাকিনী চলিয়া যাইতেই সুনীল উঠিয়া দাঁড়ায়। কাপড় কিনিতে সে এখনই যাইবে।

দেরী সয় না। অণিমার সেই তালি-দেওয়া সেমিজটা!...সুনীল বড় ঘরে গিয়াই আধ মিনিটের মধ্যে তেল মাখে মাথায়। তাড়াতাড়ি যায় পুকুর ঘাটে। পাঁচ মিনিটেই স্নান শেষ। কাপড়-জামা পরিতে মিনিট দুই। চুল আঁচড়াইতে কয়েক সেকেণ্ড। লেট-হওয়া ডেলিপ্যাসেঞ্জারের মত সুনীল সুটকেস খুলিয়া টাকা নিয়া বাহির হইয়া পড়ে। চিরকালের অসহিষ্ণু সুনীল! অণিমার মুখখানিকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার অনুকম্পার চক্রখানি ঘুরিতেছে এ-কথা সে অস্বীকার করে না। ক্ষতি কি? তবু অণিমার ঐ ছেঁড়া সেমিজটাই দায়ী—ওটা একেবারেই অসহ্য! মানায় না ওকে!

অণিমা বাড়ী ফিরিতেই সুলতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "দু'টো কাঁচা লঙ্কা চেয়ে আনতে তোর এক ঘণ্টা লাগে?"

"ও ছাই! সে-কথা যে ভুলেই গেছি!" অণিমা গালে হাত দিয়া জিব কাটিয়া অপরাধী সাজে, "রেগো না মা। ও-বেলা চেয়ে আনব'খন। টুলুরা তো সব দত্তবাড়ীই খাবে আজ। তোমার আর আমার

—সরবাটা ঘি আছে একটু, তাতেই চলে যাবে দু'জনের। এ-বেলা ডাল আর নাই বা রাঁধলে।—হিঞ্চে ভাতে দিয়ো।"

"ভাত রাঁধা যেন তোর জন্যে বাকি রয়েছে?—বছরের দিন খাবি এখন! যেমন কপাল নিয়ে এসেছিস্ তেমনি তো হবে—"

"আঃ চটো কেন অত!" অণিমা হাসিতে থাকে, "কী এমন মন্দ কপাল নিয়ে এসেছি, তা-ও তো বুঝি নে।"

"না, রাজকন্যে তুমি!"

অণিমা হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

"আবার হাসছে মেয়ে! লজ্জাও নেই। লজ্জার কথা চুলোয় যাক্, কাপড়-গুলোয় সাবান মেখে ফেলে রেখে গেছিস সেই কোন্ সকালে, তাও কি আমায় কাচতে হবে?"

"চান করবার সময় কাচব গো, তুমি অত বকবক করো না। বাদলদা এদ্দিন পরে এসেছে, কথা বলছিল—মাঝখানে হঠাৎ উঠে আসতে পারি বুঝি!"

এবার সুলতা চুপ করেন। খানিক বাদে মেয়ের সারা দেহে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করেন, "কান পৈ পৈ করে বারণ করেছি তোকে, ঐ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে বেরোস্‌নি কোথাও, তা যদি কাণেও তুলিস্!"

"আমি যেন কোন বিয়ে বাড়ীর নেমন্তন্নে গিয়েছি—সেজে-গুজে যেতে হবে!"

"ও-বাড়ীই বা অমন করে যাবি কেন!—বাদল সহুরে ছেলে, এ-সব নোংরামি দেখতে পারে না।"

"হ্যাঁ, তোমায় এসে বলেছে—দেখতে পারে না। না পারে, যাব না তাদের বাড়ী।"

"মুখ-পুড়ীর কথা শোন্! ফরসা শাড়ীখানা পরলে তোর গতর ক্ষয়ে যায়?"

এবার মেয়ে পাল্টা ঝঙ্কার দেয়, "কত শাড়ী ব্লাউজ কিনে দিয়েছ তোমরা, পরে পরে গা আমার ব্যথা হয়ে গেল," বলিয়াই ঘরের মধ্যে চলিয়া যায় রাগতভাবে।

বাহিরে সুলতা মুখ বিড় বিড় করিয়া উঠান ঝাঁট দিয়া চলিয়াছেন।

অণিমা আরশীর কাছে গিয়া দাঁড়ায়। নিজের মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখে। ফিক্ করিয়া হাসিয়া লইয়া জানিতে চায়, কেমন দেখায় তাহাতে। ঘাড় একবার বাঁ দিকে, আবার ডান দিকে ফিরাইয়া আড়-চোখে বার বার দেখে আধখানা মুখ। যে-ভাবেই দেখে কেবলি ভাল লাগে নিজেকে।—ভাল লাগে! বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়া অণিমাকে দেখিতেছে যেন আর কেহ। হ্যাঁ, অণিমা সত্যই সুন্দরী। যার যাহা ইচ্ছা বলুক না কেন, অণিমার সঙ্গে নাকি আর কাহারো তুলনা! হুঃ!

বাদলদা! বাদলদা যেন কেমন! মাঝে মাঝে এমনভাবেই তাকাইয়া থাকে যে অণিমার লজ্জা করে বড়!......বাদলদার কব্জির কাছের হাড়গুলি কি মোটা! গায়ে বুঝি অসম্ভব জোর। হাফ্-সার্টে তাহাকে মানায় কি চমৎকার! লম্বা নাকটা।......ব্যাক্-ব্রাশ চুলটাই শুধু ভাল লাগে না অণিমার। ইচ্ছা করে, একটা চিরুণী লইয়া ঐ বড় বড় ঢেউ-খেলানো চুলগুলি আঁচড়াইয়া নিজের ইচ্ছামত বাঁ-দিক ঘেঁসিয়া একটা টেরি কাটিয়া দেয়। বাদলদা শুধু চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিবে

চুপচাপ। মাঝে মাঝে না হয় বলিবে—উঃ! বড্ড লাগে অনু, তোর চিরুণীর কাঁটাগুলোয় কি ধার বাবা! তারপর অণিমার মুখের দিকে একবার না হয় একদৃষ্টে খানিকটা চাহিয়াই রইল। অণিমাও না হয় লজ্জা পাইয়া মুখখানি একটু নামাইয়া নিবে সঙ্গে সঙ্গে। বাদলদা ভারী দুষ্টু!

বাদলদা! অণিমার চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল করে চক্‌চক্। এ আবার কি! অবাক হয় অণিমা। আনন্দেও চোখে আসে জল! জীবনে এ যে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা!—এক অদ্ভুত অনুভূতি। আয়নার মধ্যে চক্‌চকে দু'ফোঁটা জল এবার চোখ ছাড়িয়া গালে নামিয়াছে।

দুয়ারের কাছে পায়ের শব্দ পাইয়াই অণিমা তাড়াতাড়ি চোখেমুখে আঁচল চাপিয়া দেয়।

"ও কিরে অনু! কাঁদছিস কেন?" সুলতা উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন।

আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে জবাব দেয় অণিমা, "কাঁদব না? রাতদিন তুমি খালি খালি বকো আমায়।"

"আ মর! তাই বলে এই বছরকার দিনে চোখের জল ফেলবি?"

উৎকণ্ঠিত মা কাছে আসিয়া মেয়ের হাত ধরে।

"কাঁদি নি গো," অণিমা এবার মুখের উপর হইতে আঁচল সরাইয়া হাসিয়া ওঠে, "চোখের মধ্যে একটা পোকা ঢুকেছিল, কত কষ্টে বার করেছি।"

"তাই বল্" —সুলতা নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহকাজে ফিরিয়া যান।

পাঁচ

উমেদপুর বাজার হইতে ফিরিবার পথে সুনীল ভাবিতে থাকে—ঝোঁকের মাথায় কাজটা কি ভাল হইল? কিন্তু চিরকাল তার ঐ এক স্বভাব। যাহা মনে হইবে—একবার যাহা করণীয় বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিবে, তাহা তখনি—সেই মুহূর্ত্তে শেষ করিয়া ফেলিতে যেন রুখিয়া ওঠে। তাহার জীবনের ধারা চলে আবেগের ঢেউ-ঢেউ-এ। তাহা না হয় চলিল। কিন্তু কাগজে-জড়ানো কাপড়ের এই বাণ্ডিলটা লইয়া বাড়ী ঢুকিতে গেলে মার চোখে যদি পড়ে? মা জানেন, ছেলে তাঁহার দত্তবাড়ী পূজার ওখানে। অণিমাদের ঘরে বাণ্ডিলটা এ বেলার মত রাখা যায় না? না। মাতা-পুত্রের ছলনার খেলাটা বুদ্ধিমতী অণিমা টের পাইবে। একটা উপায় আছে বটে। নন্দদাসের বাড়ী গিয়া সুন্দর বৌদির কাছে ঘণ্টা কয়েকের জন্য বাণ্ডিলটা রাখিবে। কিন্তু নন্দদাসের বৌএর কাছে আসল ব্যাপার ভবে আরও রঙ-ফোড়ন লইয়া দেখা দিবে। অণিমাকে দু'দিন বাদে এই নক্‌সা-পেড়ে শাড়ীখানি পরিতে দেখিয়া হিংসায় সুন্দরবৌদি পাড়ায় পাড়ায় মুখে বিষ ছড়াইয়া ফিরিবে। বিশেষ করিয়া, নন্দর বড় মেয়ে দুটি এবার পূজায় কাপড় পায় নাই।—ঐ যে নন্দ দাসই অদূরে সশরীরে হাজির।

"এই যে বাদল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তোমার অপেক্ষায় বসে বসে এই উঠে আসছি। হাতে ও কিসের বাণ্ডিল?"

সে-কথার জবাব না দিয়া সুনীল চটপট প্রশ্ন করে, "নন্দ, ঠাকুরদা বাড়ী ?"

"না।"

"মা ?"

"তিনি আর কোথায় যাবেন ?"

"না-না। এই—হ্যাঁ—মা কি বাইরের ঘরে ?—কী করছে দেখলে ?"

নন্দর দৃষ্টি ঐ কাপড়ের বাণ্ডিলের দিকে। জবাব দিল, "তিনিই তো বললেন, খোকা দত্তবাড়ী গেছে। আমি বললাম, কখখনো নয়—এই বরাবর সেখান থেকে আস্‌ছি।"

"মা তবে বাইরের ঘরে নেই, না নন্দদা ?"

"না, বড় ঘরে। আমি বলল্যাম, বাদল তবে চৌধুরীদের "

"আচ্ছা, আমি যাই" বলিয়াই সুনীল তাহার পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়ে। নন্দ ক্ষুণ্ণ অবাক হইয়া পিছনে ডাকে, "আমি যে তোমার কাছেই এসেছিলাম ভাই।"

সুনীল পশ্চাতে না তাকাইয়াই জবাব দেয়, "দত্তবাড়ী দেখা হবে। আমি আর ঘণ্টাখানেক বাদেই যাচ্ছি।"

সুনীল সন্তর্পণে বাহিরের ঘরে ঢুকিল। দেখে নাই কেহ। দূরে কাছে কেহ নাই। শুধু নীলু, বাবলু আর পাড়ার দু'চারটি ছেলে-মেয়ে উঠানের ওপাশে বসিয়া কি এক খেলা লইয়া ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি কাপড় ক'খানা সুটকেসের মধ্যে রাখিয়া দিয়া সুনীল বিছানায় আসি। সটান শুইয়া পড়ে। এক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে এতক্ষণে—যেন এক মস্ত বড় ফাঁড়া কাটিয়া গেল এইমাত্র।

শুইয়া শুইয়া সুনীল নিজের এই হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততার কথাটাই ভাবিতে থাকে। চিরকালই তার এমনধারা অসহিষ্ণু স্বভাব। তর সয় না একেবারে। তবু মনে মনে আত্মপ্রসাদ, পূজার দিনে একটা অবশ্য করণীয় কাজ শেষ করিয়া আসিয়াছে। একটুখানি ছলনার ফাঁক থাকে তো থাকুক না! তাতে কি আর এমন আসে যায়! কর্ত্তব্য জিনিষটা একেবারে নিঃস্বার্থ হইবে এমন শক্ত নীতির কোন অর্থ হয় না। তবু, সর্ব্বস্বান্ত সরকার পরিবারের প্রতি অহঙ্কৃত কর্ত্তব্যবোধের তলে তলে নন্দ দাসের অমার্জ্জিত কাঙালপনা বেশ একটু খচ্ করিয়া বিঁধিয়া যায়।...

সুনীলের আত্ম-সচেতন চঞ্চল মন নিজেকে ভুলাইবার কৌশল জানে নানা ভাবে।—এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায়, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, মিনিটে মিনিটে মনের গতি মোড় ফিরিয়া চলে। পূজা, নেমন্তন্ন, পদ্মা, ফরিদপুর, ঢাকা মেল—অবশেষে নমিতার চিঠি। ঢাকার ঠিকানায় আজই এক চিঠি দিবে। বিজয়ার প্রীতি-নমস্কারের জন্য আরো একটি সুযোগ তবে হাতে থাকে। কাল বিষ্যুদবারের ডাকে চিঠি দিলে, পরশু নাগাদ নিশ্চয় পাইবে নমিতা।...

তবু মনে অশান্তি। বুদ্ধিবিচারের বকযন্ত্রে চোলাই-করা অনুভূতির পলি দিয়া যে-এক ব্যাপক জীবন-দৃষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে সুনীল, তাহার একমাত্র ন্যায়শাস্ত্র সেই সহজ স্বাধীন বোধ' সেই মানদণ্ডে নমিতাও খাপ খায়, অণিমাও অসঙ্গতি নয়, মায়ের সঙ্গে একটুআধটু ছলনারও স্থান আছে সেখানে; কিন্তু নন্দদাসের সঙ্গে অকারণ অভিনয় সেখানে বেসুর পরদায় চলে।...

ওদিকে উঠানের একপাশে তখন মহা ধূমধামে দুর্গাপূজা চলিতেছে। রজনী কর্ম্মকারের মেঝো ছেলে নস্থ হইয়াছে পুরোহিত। গলায় পাড়ের সুতায় তৈরী লাল পৈতা। প্রতিমা গড়িয়াছে নীলু। ছ-সাত দিন আগেই কিম্ভুত-কিমাকার ছোট ছোট এক একটা পুতুল তৈরী শেষ হইয়াই ছিল। আজ সকালে শক্ত মাটির উপর চুরি-করা দোয়াতের কালি আর কৌটার সিঁদুর লেপিয়া রঙ্ দেওয়ার পালা সুসমাপ্ত। দত্তবাড়ীর প্রতিমার রঙ্-দিবার দিন পাঁচু কুমারদের ডালা হইতে কোন্ সুযোগে একটু সোনালী রঙ্ চুরি করিয়া রাখিয়াছিল। নীলু আঙ্গার ঘষিয়া কালো রঙ আর খড়ি দিয়া সাদা রঙ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। রঙে রঙে পুতুলগুলির এখন সত্যই এক অপরূপ শ্রী! সিংহটাই শুধু তৈরী করা সম্ভব হয় নাই—সে-অভাব দূর করিয়াছে বাবলুর চৈত্র সংক্রান্তির মেলায়-পাওয়া কাঠের ঘোড়াটা।

নস্থ পূজায় বসিয়াছে! পাঁচু তন্ত্রধার। বাবলু একটা কাঠি দিয়া ভাঙ্গা ক্যানেস্তারায় বাজনা সুরু করিয়াছে চমৎকার। নীলু আর বুলু নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়াছে। মন্দাকিনীর লক্ষ্মীর আসনের ছোট একখানি রেকাবের মধ্যে চাল, কলা, বাতাসা আর বাতাবী নেবুর টুক্রা। ধূপধূনা জ্বলিতেছে। জ্বলে প্রদীপ। একখণ্ড ছেঁড়া কাগজের উপর ফুল, দুর্ব্বা আর বেলপাতা। কোন দিকে কোন ত্রুটি নাই। একেবারে ষোড়শোপচারে দুর্গাপূজা!

বলির পাঁঠা সামনেই খাড়া। একটা কলাগাছের বাচ্চার গায় সমান মাপের ছোট ছোট কাঠি ফুঁড়িয়া চার-পা-ওয়ালা বাচ্চা বানান হইয়াছে। পাশেই খড়্গ—ছোট একখানি হাত-দা!

শিশু মহলের নিজস্ব দুর্গোৎসব! মন্দাকিনী বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। নীলুর ভয় ছিল, মার অজ্ঞাতসারে কাজের জিনিষ লইয়া আসায় হয় তো আজ বকুনি খাইবে। কিন্তু জননীরও সপ্রশংস সমর্থন পাইয়া উৎসাহ তার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। নস্তুকে বার বার সাবধান করিয়া দেয়, "ভালো ক'রে মন্তর পড়িস্ কিন্তু।"

ইত্যবসরে ও-বাড়ীর অণিমাও কাঁচা লঙ্কা চাহিতে আসিয়াছে বড়মার কাছে। হাসিতে হাসিতে কহিল "বড়মা দাঁড়িয়ে দেখছ কী?"

—"ওদের পাগলামো। কামারের পোকে ওরা বামুন ক'রে ছেড়েছে।"

নস্তু হাঁকিল, "এবার উলুধ্বনি দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে ক্যানস্তারার ক্যান ক্যান আওয়াজ চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। অণিমা তার হাসি আর কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারে না। অতিকষ্টে কহিল, "বড়মা বাদলদাকে ডেকে আনি। এমন পূজো সে দেখবে না?"

মন্দাকিনীও হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "খোকা বাড়ী নেই।"

"সে কি! এই তো সে বাড়ী ফিরেছে খানিক আগে। আমাদের রান্নাঘরের পেছন থেকে দেখলাম, নন্দদার সঙ্গে কথা বলছে—হাতে একটা বাণ্ডিল।"

"হাতে বাণ্ডিল? দূর! খোকা ফিরে এলে আমি বুঝি টের পেতাম না?"

"হ্যাঁ, বড়মা আমি তাকে বাড়ী ঢুকতে দেখেছি। হাতে কাগজে জড়ানো—বোধ হয় কাপড়ের বাণ্ডিলই হবে। বাজারে পাঠিয়েছিলে নাকি?—বাইরের ঘরে আছে হয়তো—আমি ডেকে আনছি।"

খোকা বাড়ী আসিয়াছে? হাতে বাণ্ডিল? কিসের বাণ্ডিল? অণিমা দেখিয়াছে?—আর সে এখনো টের পায় নাই?...

অণিমা তেমনি হাসিতে হাসিতে বৈঠকখানা-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

"বাদলদা উঠুন—উঠুন্, শিগ্‌গির আসুন।"

"ব্যাপার কী রে?" সুনীল উঠিয়া বসে।

"আসুনই না। দেখবেন চলুন।"

"কী?"

"আঃ, আগে চলুন না," অণিমার কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর।

"আগে বল্ না কী?"

"আপনি বড় অবাধ্য বলিয়া অণিমা তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বিছানা হইতে তোলে। অণিমার পিছনে পিছনে সুনীল পূজার স্থানে আসিয়া হাজির।"

ওদের তখন বলির বাজনা বাজিতেছে। লোকের অভাবে পুরোহিতই হইয়াছে জল্লাদ। "মাগো, দুগ্‌গা গো," বলিয়া নমু দা দিয়া এক কোপে কদলী-চারার পশু-জীবনের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটাইল। শিশুকণ্ঠে ওঠে একসঙ্গে হাসি আর জয়ধ্বনি!

অণিমা হাসিয়া কুটি-কুটি। হাসিতে হাসিতে কখনো পিঁড়ার গায় এলাইয়া পড়ে, কখনো সোজা হইয়া বুকের আঁচল ঠিক করিয়া লয়। সুনীলও মুচ্‌কি হাসে। উপভোগ্য দৃশ্য বটে! মন্দাকিনীও হাসিতে যোগ দিয়াছেন—কিন্তু খানিক আগের সেই উত্তাপটুকু যেন আর নাই!

এবার বিসর্জ্জনের পালা। শিশু-মহলের সর্ব্বজনীন পূজার রীতিনীতিও বেয়াড়া রকমের। একদিনেই বোধন, পূজা আর বিসর্জ্জন। সকলে প্রতিমা লইয়া পুকুরঘাটে চলিল।

"চলুন বাদলদা, ভাসান দেখতে যাই," বলিয়া অণিমা ওদের পিছন লইল। সুনীলও চলে সঙ্গে সঙ্গে। ছেলেমেয়েদের এই সহজ সুন্দর অভিনয়ের চেয়েও তার কাছে এখন ভালো লাগে চল-চঞ্চল অণিমারাণীর অনর্গল হাসি। তার পাতলা গড়নখানির আদ্যন্ত এক অপরিমেয় আনন্দোচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত হইয়া ছমছম করে যেন।

অণিমা পিছন ফিরিয়া ডাকিল, "বড়মা, তুমি এলে না?"

মন্দাকিনী কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘরে ফিরিয়া যান। অণিমার এই বাড়াবাড়ি তার কাছে আজ কি জানি কেন ভালো লাগে না। এ কি বেহায়াপনা! বাদল যেন বাবলুর মত একরত্তি ছেলে আর কি!

একটা কথা সহসা তার মনে পড়িয়া যায়। গত আষাঢ় মাসে সুলতা নিস্তারিণী পিশীর মারফৎ সুনীলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব আনিয়াছিল। মন্দাকিনী সম্মত হন নাই। কথাটা তার ছেলে অবশ্য জানে না। অনুও না জানিতে পারে। সুলতা তো জানে। মেয়েকে অমন যখন-তখন এ-বাড়ীতে পাঠায় কোন্ সাহসে? ওদের দুটিতে এত মাখামাখি মোটেই ভালো নয়।...

পুকুর ঘাট হইতে সুনীল ও অণিমা হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিল বাহিরের ঘরের বারান্দায়। বেতের কেদারাটা পদ্মার দিকে মুখ করিয়াই পাতা। সুনীল বসিয়া পড়িল আরামের গা ভাঙ্গিয়া। অণিমা বসিল

মাটিতে—হাঁটু ভাঙ্গিয়া তেরছা ভঙ্গিতে। আলতা-পরা পা-দু'খানির তলায় সারা রাজ্যের ধূলা—তবু কি নরম!

অণিমার পদযুগল হইতে লোভাতুর দৃষ্টি ফিরাইয়া সুনীল কহিল, "অনু, আমরাও ছোট-বেলায় এমন পূজো-পূজো খেলতাম। তোর মনে পড়ে?"

"একটু একটু। আপনি একবার ডাকঘর খুলেছিলেন স্পষ্ট মনে আছে। এ-বাড়ী থেকে আমাদের ঢেঁকিঘর অবধি তার খাটিয়েছিলেন। পিয়ন হয়েছিল বলাই কাকা—মনে আছে?"

"হুঁ"—সুনীল পদ্মার দিকে চাহিয়া জবাব দেয়। অতীতের কাহিনী সব আজ পাতলা কুয়াশায় ঢাকা; আবছায়ার মত, কিছু কিছু দেখা যায়—বাকিটুকু পূরণ করে কল্পনা।

কবুতরের খোপের মুখে—বক্‌বকম্। একজোড়া পায়রা বাহির হইতে উড়িয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। দূর হইতে কুকুরটা চাহিয়া আছে নিষ্ফল আক্রোশে—কবুতর দম্পতি তার নাগালের বাহিরে।

উভয় পক্ষে চলিল এ-কথা, সে-কথা, নানা কথা। নমিতা-প্রসঙ্গ আজ আর উঠিল না। সুনীল কিন্তু ইহাই চায়। অণিমার মুখে নমিতার কথা বড় ভালো লাগে তার। কিন্তু কে যে লক্ষ্য আর কে উপলক্ষ, সুনীল এখনো তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না।

"দ্যাখ দ্যাখ অনু, কী সুন্দর!" অণিমা সুনীলের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া নদীর দিকে মুখ ফিরায়। এক ঝাঁক বেলে-হাঁস দিয়াছে ওপার থেকে এপারে পাড়ি। এখনো তারা বহুদূরে—নীল আকাশের পটে, নদীর মাঝামাঝি। পাখীগুলি চার সারিতে রওনা হইয়াছে—

সামনের পংক্তি বড়, তারপর ছোট, তারপরে একটু বড়, শেষের লাইনটা অনেক ছোট। নির্মেঘ আকাশের গায় সাদা ডানার সরল রেখা কয়টি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর, ছোট থেকে বড় হইয়া আসিতেছে ক্রমে ক্রমে।

সুনীল প্রশ্ন করে, "পাখীগুলো কতদূরে বলতে পারিস্?"

"আধ মাইল?"

"দূর!"

"তার বেশি?"

"অনেক—কম্‌সে কম দেড় মাইল হবে। এখান থেকে ফরিদপুরের পাড় কত দূর বল্ তো?"

"দু' মাইল।"

"তিন মাইলেরও বেশি—ধাঃ, তোর কোন আন্দাজ-ই নেই।"

—"এ-কথা নমিতাও বলতে পারতো না," অণিমা একটু বাঁকাইয়া হাসে।

"আবার নমিতা?"

"ও! রাগ ছাখ না," বলিয়া অণিমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "নাম শুনে খুশি হচ্ছেন, তবু তা স্বীকার করবেন না! পেটে ভোগ, মুখে লাজ!"

"ও অনি!"—পদিপিশী অণিমাকে ডাকিলেন! এককালের ব্রাহ্মণ বালবিধবা পদিপিশী বৃদ্ধবয়সে আজ সারা গ্রামের সরকারী গেজেট। গ্রামে বাহির হইয়াছেন আজ কি মতলব কে জানে।

"ও ছুঁড়ি, কাণের মাথা খেয়েছিস্—কথাই শুনতে পাস্ না?"

অণিমা এবার মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া সাড়া দেয়, "কী পিশী ?"

"দত্তবাড়ী নেমতন্ন নেই তোদের ?"

"আমাদের শুধু পুরুষদের বলেছে, মেয়েদের তো বলেনি এবার।"

"আমাদের চিরকাল ঠাকুর-ঠাকৃরাণ বলে এসেছে।—এবার শুধু ঠাকুরদেরই বলেছে। ঠাকৃরাণদের খাওয়াতে পাঁচশ' টাকা খরচ পড়তো কিনা—ফতুর হয় লোক সাধে!"

সুনীল ও অণিমার কাছ থেকে এমন একটা অভিমতে এতটুকু সায় না পাইয়া পদিপিশি গডগড করিয়া উঠানটুকু পার হইয়া যান। বাড়ীটা পার হন নাই কিন্তু। বড়-ঘরের পিছনের দুয়ার দিয়া ঘরে ঢুকিয়া অস্বচ্ছ কণ্ঠে ডাকিলেন, "নীলুর মা ঘরে আছিস্ ?"

"কে, পিশী ?—বসুন।"

"আর বসব! কালে কালে সব হচ্ছে কী, দেখে শুনে হাত-পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চায়। ধর্ম্মকর্ম্ম মানে না কেউ, আকাল কি সাধে আসে!"

মন্দাকিনী বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দেন।

"দ্যাখ না বৌ, দত্তবাড়ীর পূজোয় এবার গাঁয়ের ঠাকৃরাণদের খেতে বলেনি!"

"ওদের সেদিন আর নেই তো পিশী—"

"তা হ'লে পূজোর পাট তুলে দিলেই হয়।" পদিপিশা বলিয়া চলিলেন, "আজেবাজে খরচা তো কম হচ্ছে না। অষ্টমীর দিন রাত্তিরে থিয়াটার হবে, তাতে কোন্ আর দশ-বিশ টাকা খরচ হবে না! ইদিকে যত খরচ কমানো হচ্ছে আসল কাজে। ওদের ছেলে-ছোকরারা তো

পূজো-মণ্ডপের কাছ দিয়েও ঘেঁষে না। পাড়ার ছেলেরা আছে তাই রক্ষে।"

"সে কথা যদি বললে পিশী, তবে—" মন্দাকিনী কহিলেন, "এখনকার নিয়মই যেন এই। আমার ছেলেরও কী মতি হয়েছে, অঞ্জলি দেয় না—বলে, না খেয়ে অত বেলা অবধি শুকিয়ে থেকে পুণ্যি করার লোভ নেই। আমার তো বুক কাঁপে পিশী। কী থেকে যে কী হয়—কে জানে গো!"

"ভাল কথা নীলুর মা!" পদিপিশী গলাটা এবার আরও খাটো করিয়া লন, "নরেশের মেয়েটার সঙ্গে ছেলেকে অত মিশতে দিস নে যেন। ছুঁড়িটার অহঙ্কার দেখেছিস?— সরম-ভরম এতটুকু নেই। দশ বছর ধুবড়ী থেকে যেন মেম-সাহেব হয়ে এসেছেন।"

মন্দাকিনী চুপ করিয়া থাকেন। যে-সংশয় তার মনেও দেখা দিয়াছে খানিক আগে, পদিপিশী তাহাই খোঁচাইয়া তুলিতে চাহেন।

"চুপ করে থাকিস নে: অত মাখামাখি ভাল নয়। মেয়েটা তো কচি খুকী নয় এখন। বিয়ে দিলে এদ্দিনে তিন ছেলের মা হত লো!"

"কী যে বলো পিশী, ছোট বেলা থেকে ওরা যে ভাইবোনের মতো।" মন্দাকিনী প্রতিবাদ না জানাইয়া পারেন না। অণিমার সমালোচনা গায়ে লাগে না, কিন্তু পদিপিশীর ইঙ্গিতের মধ্যে তার ছেলেও যে রহিয়াছে।

"দ্যাখ বৌ, শত হলেও আগুন আর ঘি।—এক জায়গায় রাখতে নেই।"

মন্দাকিনী চুপ করিয়া থাকেন।

প্রতিপক্ষকে নীরব পাইয়া পদিপিশী দ্বিগুণ উৎসাহে এবার ফস্ করিয়া বলিয়া বসেন, "আগে থেকে সাবধান হ বৌ! নইলে শেষটায় চোখের জলে ভাস্‌তে হবে।—জানিস তো, উমেদপুরের নরেন হালদারের মেয়েটা শেষকালে কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

মন্দাকিনী এবার ফোঁস করিয়া ওঠেন, "মুখে লাগাম টেনে কথা বলবেন পিশী! আমার ছেলে আর নবগোপাল সিকদারের ছেলেতে সগ্‌গ-পাতাল তফাৎ।"

"এ তো আচ্ছা বিপদ! ভাল বললেও মন্দ শুনিস্!"

"আপনার নিজের মনে ময়লা—তাই অমন কথা ভাবেন।"

"তোর ছেলেকে আবার কী বললাম লো?" পদিপিশী অবাক হইয়া কথাটা হালকা করিতে চাহিলেন।

কিন্তু প্রসঙ্গটা আর হালকা হয় না। খানিকক্ষণ নানা বাজে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া অপমানিত পদিপিশী এক সময় ঐ পিছনদুয়ার দিয়াই সসম্মানে সরিয়া পড়িলেন।

এদিকে সুনীল ও অণিমা নদীর দিকে চাহিয়া আছে। আর এক ঝাঁক পাখী ওপার হইতে পাড়ি ধরিয়াছে। এপারে পৌঁছিল বলিয়া।

পাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পাখীর ঝাঁক কে জানে কেন দু'ভাগ হইয়া যায়। এক সার একটু দক্ষিণে মোড় ফিরিয়া ধীরে ধীরে গাছের আড়ালে মিলাইয়া গেল। আর একদল বরাবর সুনীলদের বাড়ীর উপর দিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল পতপত শব্দে।

"এ-দলটা দুভাগ হ'ল কেন বলতে পারিস?"

"আপনিও বলতে পারেন না।—ছেলেপেলের মতো খালি খালি বাজে বক্‌ছেন," বলিয়া অণিমা এক ঝলক হাসির তরঙ্গ তোলে। অণিমার দাঁতগুলি তো ভারী সুন্দর! এ কদিন ঐসাদা ধবধবে দাঁতের পাটি সুনীলের নজরেও পরে নাই, এ কেমন কথা!

বাদলদার চোখ হইতে নিজের চোখদুটি ফিরাইতেই অণিমার দৃষ্টি পড়ে লাউএর মাচার উপর। বাঁশের কঞ্চির উপর একটা ময়না আসিয়া উড়িয়া বসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আসে ঢেঁকিঘর থেকে বেড়ালের বাচ্চাটা। উঠানের মাঝখান থেকে কুকুরটাও শয়ন ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। তাড়া খাইয়া পাখীর বাচ্চা পালায়। বিড়ালের বাচ্চাটার আশাভঙ্গের ঝাঁজ গেল বাঘার উপর। লাফাইয়া পড়ে কুকুরটার ঘাড়ে। বাঘা তৎক্ষণাৎ চিৎ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। আবার উঠিতে না উঠিতে মার্জ্জার শিশু কুকুরের ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরে—আদদের কামড়। সুনীল ও অণিমা মিলিত দৃষ্টিতে এই অঘটন ঘটন দেখিতেছিল। বিড়ালটার আক্রমণ বাঘা বেশ খুশির সহিতই গ্রহণ করিতেছে।

"দেখ্‌ছিস, বাচ্চাটার এতটকু ভয় নেই—বাঘাকে গ্রাহ্যই করছে না।"

"বাঘা কিছু বলবে না—এ ভরসায় না ওর এত সাহস।"

সুনীল একটু কৌতুকের হাসি হাসিয়া কহিল, "ওরা দুটিতে তাহ'লে প্রেমে পড়েছে।"

"বেড়ালের বাচ্চাটা যে ব্যাটাছেলে গো।"

"অ্যা? তাই নাকি?"—বলিয়া সুনীল এমনি বোকার মত বিস্ময়ের

ণ করে যে, অণিমা ওঠে খিলখিল করিয়া হাসিয়া। হাসি তো নয়, ঝক্‌ঝক্ করে অণিমার দুপাটি সাদা ধবধবে দাঁত '—যেন তপ্ত কড়াই থেকে এক-বলকের পাতলা দুধ উতলাইয়া পড়ে এইমাত্র।

"আপনি এত-ও হাসাতে পারেন বাদলদা!"—অণিমা আবার

সুনীল যেন বোবা—একদৃষ্টে শুধু চাহিয়াই আছে। ঐ হাসির সারা দুনিয়া এখন চাপা পড়িয়াছে আর কি! শুধু সে আর অণিমা, অণিমা আর সে। আর মাঝখানে শুধু একটুখানি অসহ্য ভঙ্গুর ব্যবধান। জীবনের মর্ম্মমূল অবধি কাঁপিয়া ওঠে যেন।

অণিমা চোখেমুখে হাসি চাপিতে চাপিতে আলগা খোঁপা ঠিক করিয়া লয় দুইটি সুডোল হাতে। দুই কনুই-এর দুদিকে দুইটি ক্তমাংসের জ্যামিতিক কোণ—বিশেষ মুহূর্ত্তের বিশেষ এক ঙ্গি। সুনীলের লোভ যায়—ইচ্ছা হয়, এক টান মারিয়া ঐ শিথিল খোঁপা খুলিয়া দেয়; তারপর অণিমার কপালের উপরে—কয়েক গাছ অশিষ্ট চুল বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজিয়া থামিয়া আছে যেখানে—সেই সজল মাধুর্য্যের উপর চট্‌ করিয়া একটা চুমু খাইয়া ফেলে। পরমুহূর্ত্তে না হয় দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে। দেখিয়া ফেলে যদি কেহ, দেখিলই বা! এত-বড় এক পরম ক্ষণের এতটুকু প্রাপ্তিতেই আপত্তি? সারা দুনিয়া শত কণ্ঠে ছি-ছি করিতে থাকিলেও, অবাধ কালের বুকে এই সত্য মুহূর্ত্তের সামান্য ঘটনাটুকু নিখুঁত একটি কালো দাগ কাটিয়া রাখুক না—অণিমার ভরাট মুখখানির বাম গণ্ডের ঐ সুন্দর ছোট্ট তিলটুকুর খুঁতের মতই!

"অনু ৷"

অণিমা মুখ তোলে না।

"অনু!"

অণিমা সলজ্জ চোখ দুটি তোলে এবার! সুনীল কি যেন বলিবার জন্য মুখ খুলিবে এমন সময় পিছন হইতে গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিলেন মন্দাকিনী, "খোকা!"

সুনীল ও অণিমা একসঙ্গেই চমকাইয়া মুখ ফিরায়।

"এখানে বসে বসে কেবল হাসাহাসি করছিস! — তোর যদি এতটকুও আক্কেল থাকত!—সন্ধ্যে হয়ে এল। পূজোবাড়ী পেসাদ নিতে যাবি কি শেষকালে রাতদুপুরে ?" বলিয়াই মন্দাকিনী যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি সদর্প গাম্ভীর্য্য লইয়া চলিয়া গেলেন। চলিয়া গেলেন রসের ভারে টুসটুস-করা এক গোছা আঙুরফল নির্দ্দয় পদাঘাতে ছড়াইয়া মাড়াইয়া!

সুনীল স্তব্ধের মত বসিয়া থাকে নির্ব্বাক। অণিমা আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়ে নিঃশব্দে। বড়মার কাছ থেকে লঙ্কা চাওয়া এ-বেলাও হইয়া উঠিল না।

অণিমা চলিয়া যাইতেই সুনীল দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে মনে মনে। মার এ কেমনধারা রাগ-দেখানো ? সন্ধ্যার এখনো অনেক বাকী। সূর্য্য মাঝ-আকাশ ছাড়িয়া সবে মাত্র পশ্চিমে হেলিয়াছে। বেলা এখন বড় জোর আড়াইটা। মা নিজেই তো বলিয়াছেন, পূজা বাড়ীর নেমন্তন্ন সন্ধ্যার আগে নয়। দত্তবাড়ী কি সাত শ' মাইল দূরে ?

মন্দাকিনী তখন এই নিতান্ত অবেলায় ও-ঘরে নিজের বিছানায় শুইয়া

পড়িয়াছেন। ঘন ঘন হাত-পাখা নাড়িয়া বোধ হয় মাথাটা ঠাণ্ডা করিতে চান। পদ্দিপিশীর উপরে রাগটা এখনো পড়ে নাই।...

পদ্মার আক্রোশ আজ আর তেমন স্পষ্ট নয়। তবু যতখানি ভাঙ্গিবার কথা ভাঙিয়াছে অনায়াসেই।

ছয়

পুত্র বাড়ীর বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দাকিনী আসিয়া শ্বশুরের ঘরে ঢুকিলেন। চতুর্দ্দিকে সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইতেই আলমারীর মাথায় কাগজে-মোড়া কাপড়ের বাণ্ডিলটা দেখিতে পান। তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বাণ্ডিলটা পাড়িতেই তাঁহার চক্ষু স্থির। এই ছেলের পাড়া-বেড়ানো! এই দুপুরবেলাই যদি উমেদপুর বাজারে না গেলে নয়, তাহার কাছে অমন মিথ্যা কথার কি প্রয়োজন ছিল? মন্দাকিনী প্রথমটায় খানিক স্তব্ধের মত বসিয়া রহিলেন। কাপড় দিবার কথা সুলতা আর অণিমাকে। কিন্তু এ যে ছেলে-বুড়ো সকলেরই একখানা করিয়া ধুতি আর শাড়ী! অণিমাকে কাপড় দিতে হইবে বলিয়া কি তাহা এত দামের শাড়ী? কমলা রঙের শাড়ীখানা চার-পাঁচ টাকার কম কিছুতেই নয়। মন্দাকিনীর সর্ব্বাঙ্গ রাগে থর থর করিয়া কাঁপে। এত যদি উনি নিজেই কর্ত্তা, তবে আগে মার সম্মতি লওয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

মন্দাকিনী মা হইবার আগেই তাঁর শাশুড়ী মারা যান। সেই থেকে এ-সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী তিনিই। শ্বশুর আর স্বামীর উপর এতকাল যে আবদার আর অধিকার খাটাইয়া আসিয়াছেন সেই একটানা অবাধ আধিপত্যের উপর পুত্রের এই সামান্য হস্তক্ষেপ আজ দারুণ আঘাত করিয়াছে। অভিমানে মন্দাকিনী গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন বহুক্ষণ। কিসের এত দরদ? অণিমারা এমন কোন্ আপন জন?

মন্দাকিনী শঙ্কিত হইয়া ওঠেন। আবার মনে পড়ে, গত চৈত্র মাসে সুলতা সুনীলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করেন। মন্দাকিনী হাসিয়া সে প্রস্তাব উড়াইয়া দিয়াছিলেন। দশ-বিশ ভরি সোনা পাইবার ভরসা নাই, আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে সকলকে বিবাহ উপলক্ষে এক স্থানে জড় করিবার আশা নাই, ছেলে তাঁহার, বেশী কিছু না হউক, অন্ততঃ এক সেট্ সোনার বোতাম আর একটা হাতঘড়িও পাইবে না—এমন বিবাহ মন্দাকিনী মনের কোণেও স্থান দেন না। বিশেষত, নানা স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে —দর উঠিয়াছে আড়াই হাজার পর্য্যন্ত। সুলতার দুরাশা তো কম নয়! যাক্ প্রস্তাবটা উঠিতে না উঠিতেই থামিয়া যায়। মন্দাকিনীও কথাটা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ তার মনে দারুণ শঙ্কা দেখা দিয়াছে। এ নিশ্চয়ই সুলতার চক্রান্ত। মেয়েকে তাঁর ছেলের ঘাড়ে গছাইতে চায়। তারই জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে সে। নহিলে, মা হইয়া অমন সোমত্ত মেয়েকে এ-বাড়ীতে যখন-তখন আসিতে দেয় কোন্ প্রাণে? যেমন মা, তেমনি মেয়ে! পুরুষের কাছে হো-হো হি-হি করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া মেয়েছেলেকে

অমন হেলিয়া দুলিয়া পড়িতে কে কবে দেখিয়াছে! সতের-আঠার বছরের মেয়ের এতটুকু কাণ্ডজ্ঞানও থাকিতে নাই!—তাঁর ছেলের কি দোষ? ওদের মনে যে এত বিষ সে কি করিয়া জানিবে? ছেলেকে তাঁর ভালমানুষ পাইয়া মা-মেয়েতে মিলিয়া পর করিবার চেষ্টায় আছে। সে গুড়ে বালি! মন্দাকিনী কঠোর সঙ্কল্পে বুক বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়ান।

কাপড়ের পুঁটুলিটা লইয়া অণিমাদের বাড়ীর উদ্দেশে রওয়ানা হন। আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শীদের সঙ্গে ভদ্রতা-লৌকিকতা বজায় রাখিবার মালিক এখনও তিনিই। ছেলে যত বড়ই হউক, যত স্বাধীন ইচ্ছাই থাকুক তার, তাঁরই ছেলে সে। মন্দাকিনী মনে মনে আহত আত্মাভিমানে ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠেন।

সুলতা ঘরের মেঝেতে কাঁথা সেলাই করিতে বসিয়াছেন। মন্দাকিনীকে দেখিয়াই অনুগৃহীত অনুগতের মত উঠিয়া দাঁড়ান, "দিদি, হঠাৎ কী মনে করে?—অনু, তোর বড়মাকে পিঁড়ি দে একখানা।"

অণিমা পিঁড়ি পাতিয়া দেয়। মন্দাকিনী বসিয়া পড়েন গম্ভীর মুখে। তাহার এই মেঘভার লক্ষ্য করিল অণিমা—খানিক আগের উগ্র মূর্ত্তির সঙ্গে ইহার একটা যোগাযোগ আছে অনুমান করিয়া লজ্জায় একটু রাঙা হইয়া ওঠে।

"এ নতুন কাপড় কিসের দিদি?"

"তোদের দিতে এসেছি, সুলু।"

"সে কি!" বিস্ফারিত নেত্রে সুলতা মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকান।

"কেন, আমি বুঝি তোদের পূজোর কাপড় দিতে পারি না ?"

'-তা বল্‌ছি নে দিদি। ভাব্‌ছি, এ দুর্দ্দিনে থামকা—"

"তোরা কি আমার পর ?—আমার বড় খুকী যাবার পর অনুকে তো আমি কোলের কাছে শুইয়ে মরার শোক ভুলতে চেয়েছিলাম। বাদল আর অনু মায়ের পেটের ভাই-বোনের চেয়ে বুঝি কম ?"

"সে-কথা মিথ্যে নয়," সুলতা মৃদু হাসিয়া বলিতে থাকেন, "মেয়েকে আমি শুধু পেটেই ধরেছি, ও তোমারি মেয়ে দিদি দ্যাখো না, আমি এত ক'রে বললাম—অনু, শীতের দিন আস্‌ছে, আমি আজকাল আর ভালো ক'রে চোখে দেখতে পাই না, ছুঁচে সূতো পরাতে অন্য লোক ডাকতে হয়, তুই কাঁথা নিয়ে বস। মেয়ে কথা আমার কানেও তুললে না। সে এখন রুমাল সেলাই নিয়েই ব্যস্ত—বাদলদা চলে যাবার আগে ফুল তুলে তাকে দেওয়া চাই।"

মন্দাকিনীর গা জ্বালা করে !

সুলতা কিন্তু তেমনি নিশ্চিন্তে বলিয়া চলিয়াছেন, "দিদি, তুমি রত্ন পেটে ধরেছ। ও ছেলে এখন বেঁচে থাকলে হয়।"

মন্দাকিনী মাথা নোয়াইয়া কাপড়গুলি এক একখানা করিয়া মাটিতে রাখিতে রাখিতে বলিয়া চলিলেন, "এ খানা তোর, এ শাড়িখানা অনুর—এ তিনখানা ছোটদের, অনুর বাবার জন্যে সাদা পাড় আনতে বলেছিলাম, তাই এনেছে।"

"কাপড় বুঝি বাদল কিনে এনেছে ?"

"না...হ্যাঁ...আমি বললাম, পূজোর মধ্যেই যদি কাপড় না দেওয়া

হ'ল তবে দেওয়া না-দেওয়া সমান। খোকাকে উমেদপুরে এই দুপুর বেলাই পাঠিয়ে দিলাম।"

সুলতা উল্লাস চাপিয়া বলিলেন, "তোমার যত বাড়াবাড়ি।—এই দুপুর রোদে ছেলেকে পাঠিয়েছ এক ক্রোশ পথ দূরে উমেদপুর বাজারে! ছেলেটা বাড়ীতে দুদিন জিরোতে এসেছে, তাও তোমরা দেবে না।"

মন্দাকিনী অসহ্য মনোভাব অতিকষ্টে চাপিয়া রাখেন। এ যে মায়ের চেয়েও মাসীর দরদ বেশী!

"—অনুর সিল্কের শাড়িখানি পুরোনো হয়ে গেছে—জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। যাক্, এ শাড়িখানি ধুইয়ে বাক্সে তুলে রাখব। কোথাও বেরোতে হ'লে—আমার তো আর সাধ্যি নেই দিদি!"

"হ্যাঁ, আমিই খোকাকে বলেছিলাম, অনুর শাড়ি ভালো দেখে আনতে। নইলে, ওর বুঝি সে-সব খেয়াল আছে!"

সুলতা মেয়েকে ডাকেন, "অনু! তুই আবার কোথায় গেলি?"

"কেন?" ঘরের বাহির হইতে জবাব আসে।

"শাড়িখানা প'রে তোর বড়মাকে একবার পেন্নাম করে যা।"

বাহির হইতে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। অণিমা পিঁড়ায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে মা আর বড়মার কথা শুনিতেছে।

"সুলু, খোকাকে এবারই বিয়ে দেব।"

"বাদল নাকি বিয়ে করতে চায় না?"

"কে বললে?"

"অনু বলছিল।"

"অনু তো সব জানে! আমার পেটের ছেলেকে আমি চিনি না,

চিনতে এসেছে অপরে!"—মন্দাকিনী মূহূর্ত্তে গরম হইয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণে সামলাইয়া লইয়া নরম সুরে কহিলেন, "ও সব ওর মনের কথা নয়, মুখের কথা। নিজের বিয়ের কথা বুঝি নিজে সেধে বলবে?"

এবার সুলতা একটু অবাক হন। মন্দাকিনীর কথার মধ্যে হঠাৎ যে অকারণ উষ্মা প্রকাশ পাইল তাহার মর্ম্ম ভাল বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়া রহিলেন।

"ছেলের কর্ত্তা তার ঠাকুর্দ্দা, আর তার মা।—তারা যা ঠিক করবে তা মানবে না এমন ছেলেই আমার নয়।" একটু ঢোক গিলিয়া লইয়া মন্দাকিনী বলিয়া যান, "মালদহ থেকে যে সম্বন্ধ এসেছে সেখানেই কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে ফেলি, কী বলিস্ সুলু?—মেয়ে দেখতে ভালো, গায়ের রঙ তোর চেয়েও ফরসা হবে। একুশ ভরি সোনা দেবে। শ পাঁচেক টাকার জিনিষপত্তর দেবে বলেছে। নগদও আটশ' টাকার মত দিতে চায়। হাজার টাকা দিতে রাজী হ'লেই ওখানে পাকা কথা দিয়ে ফেলব।"

সুলতা চুপ করিয়া শুনিয়া যান—কোনরূপ মন্তব্য জানান না।

"কী বলিস্ সুলু?—তোদের কী মত?—আত্মীয়স্বজনদেরও একবার জিগ্‌গেশ করে নিতে হয়।"

"বেশ তো—এখানেই কাজ ঠিক করো," সুলতা কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "বাদলের বিয়ে, এ যে আমাদের সকলকারই আনন্দের বিষয়!—কিন্তু···দিদি, বাদলের বৌ দেখে-শুনে পছন্দ করে আনতে হবে। শুধু টাকার কথা ভাবলেই তো চলবে না। অমন ছেলের সঙ্গে তেমনি মেয়েই খুঁজে বার করা চাই।"

"সন্ধ্যে হয়ে এল সুলু, আমি এবার উঠি," বলিয়া মন্দাকিনী সহসা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান।

সুলতা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে বলিলেন, "বাদলকে একবার আসতে বলো দিদি! ইস্কুল নিয়ে ওর সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।"

"হুঁ"—মন্দাকিনী বক্রকটাক্ষে একবার পিঁড়ার গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়ানো অণিমাকে দেখিয়া লইয়া উঠানটুকু পার হইয়া যান।

অণিমা আস্তে আস্তে ঘরে ফিরিয়া আসে। এই পূজার কাপড় যে বড়মা দেন নাই—অন্তত তাঁর ইহাতে পুরাপুরি সম্মতি ছিল না সে-কথা অণিমার বুঝিতে বাকী নাই। দুপুরের ঘটনা আর সন্ধ্যার এই পরিশিষ্টের মধ্যে যে একটা যোগাসূত্র রহিয়াছে তাহা অনুমান করিয়া লইবার মত বয়স ও বুদ্ধি তাহার আছে। ছি! বড়মার কি কুৎসিত মন। বাদলদার মা'র উপর অণিমা মনে মনে ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মার উপরও তার রাগ হয় দারুণ। মার এই কাঙালপনা অসহ্য! বড়মা এমন কোন্ রাণী রাসমণি, আর তারাই বা এমন কি অথই জলে পড়িয়াছে যে, বার বার করুণা ভিক্ষা চাহিতে হইবে কালীঘাটের ভিখারীর মত?

সুলতা ঘরে ঢুকিয়াই সর্ব্বপ্রথমে মেয়ের উপর ঝঙ্কার দিয়া ওঠেন, "তোর বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। শাড়িখানা পরে তোর বড়মার পায়ের ধূলো নিলে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হত শুনি?—এমন জেদের মুখে আগুন!"

"থামো। আর বক্‌বক্ করো না," বলিয়া অণিমা সন্ধ্যা-প্রদীপটা জ্বালিতে যায়।

সুলতা চতুর্গুণ ঝাঁজিয়া উঠিলেন, "পরের ঘরে গেলে এত জেদ চলবে না তখন—দেখে নিস্।"

অণিমা ফিরিয়া দাঁড়ায়। রাগে তার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে থাকে। মার মতই ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "হ্যাঙলা স্বভাব তোমার ম'লেও যাবে না। যার তার কাছে অমন দৈন্য জানাতে লজ্জা করে না তোমার?"

"পোড়ারমুখীর কথা শোন! বাদলরা যেন আমাদের পর!"

"আপনার লোক যে নয় তা তুমিও জানো, আমিও জানি।—নতুন কাপড় দেখে ভিখিরীর মত তুমি নীলুর মার পা চাটতে পার, আমি পারি না।"

"কী বললি!" সুলতা টগবগ করিয়া ওঠেন, "তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! হায় ভগবান! পেটের মেয়েও চোক রাঙায়।—চোকখাকী! তুই তো জানিস না, তোর ভাবনায় রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। মর তুই, মর—মরে আমায় নিষ্কৃতি দিয়ে যা।—যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!"

"আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।"

"বটে! যা না চলে—যেখানে দু'চোক যায় চলে যা। কত কুটুম আছে, বরণডালা সাজিয়ে রেখেছে। যা না চোকখাকী। কে তোকে সারা জীবন খাওয়াবে—কার অত দায় ঠেকেছে!"

মা-মেয়েতে এমন ঝগড়া প্রায়ই হয়। গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে উভয়েরই। কিন্তু ইদানীং অণিমার বড় করিয়া বাজে ঐ ভাত কাপড়ের খোঁটা।

কবে, কোথায়, কোন্ ঘরে গিয়া, ভাত-কাপড়ের একটা আশ্রয় মিলিবে তারই জন্য যেন আজন্ম আবেষ্টনের মধ্যে জলের উপর তেলের মত আলগা হইয়া ভাসিয়া থাকিতে হইবে—মিশ খাইবার অধিকার নাই। মায়ের সঙ্গে সমানে সমানে লড়িতে গিয়া এই উদরান্নের প্রসঙ্গে আসিলেই সহসা কে যেন তার মুখ সুচসুতায় সেলাই করিয়া দেয়।

সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া অণিমা নীরবে এই অসময়ে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সুলতার মুখ কিন্তু তখনও বন্ধ হয় নাই। ঝাঁজিয়াই চলিয়াছেন, "আমার হয়েছে মরণ। বাপ তো খায় দায় আর পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। কুটো ছিঁড়ে দু'খানা করবার উপকার নেই। অথচ বাবুর মান কত! তোর আর দোষ কী! যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি তো হবি। হাভাতের গোষ্ঠী! আবার আমায় বলে হ্যাঙলা!"

খানিকবাদে গজ গজ করিতে করিতে সুলতা আহ্নিক সারিতে বসেন। আহ্নিক না ছাই! থাকিয়া থাকিয়া মেয়ের উপর গায়ের ঝাল মিটাইয়া লন। অণিমা কিন্তু চুপ করিয়াই আছে। কথার পৃষ্ঠে কথা বলিতে সে-ও জানে। কিন্তু নানা কারণে মার ভাত কাপড়ের খোঁটাটা আজ তাহার মনে একটা নিষ্ফল আক্রোশের ঝড় তুলিয়াছে। ধুবড়ী থাকিলে এতদিনে তার ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় হইয়া আসিত। সুরমা দিদির মত ট্রেণিং পাশ করিতে পারিলে আজ তারও একটা বিহিত হইত নিশ্চয়ই।

আধ ঘণ্টা বাদে সুলতা আহ্নিক সারিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। বহুক্ষণ নীরবতার পর আসনটা গুটাইতে গুটাইতে আবার সুরু করেন, "আঠার

বছরের বুড়ী মাগী—এখনো তার হুঁস নেই এতটুকু!—একদিন তোকেও মেয়ের মা হতে হবে রে—বুঝবি তখন কত জ্বালা।”

এমন সময় দুয়ারের বাহির হইতে বাদলের সহাস্য কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে, “ন’কাকীমা, মা-মেয়েতে ঝগড়া সুরু করেছ বুঝি?”

“বাদল? আয় আয়!” সুলতার কণ্ঠস্বর চট্ করিয়া কোমল পরদায় নামিয়া আসে, “দিদি বুঝি পাঠিয়ে দিয়েছে? আমি যে তোকে আসতে বলে দিয়েছিলাম—”

“কার কথা বল্‌ছ?”

“তোর মা।—এ গাঁয়ে আমার আর দিদি কে রে?”

“মা বুঝি তোমাদের এখানে এসেছিল?”

“হ্যাঁ! আমাদের সব পূজোর কাপড় দিয়ে গেল।—কী পাগলামো তোমাদের বলো তো?”

সুনীলের চক্ষু স্থির!

“পূজোর কাপড়—হ্যাঁ—তা...মা কখন এসেছিল কাকীমা?”

“এই তো সন্ধ্যের আগে।—দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ কেন?”

মেঝের উপর কাপড়গুলি তেমনি পড়িয়া আছে। সুনীল দেখিয়াই সমস্ত ব্যাপার মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিয়া লইল। প্রথমে ভয়, তারপর লজ্জা, তারপর রাগ—তিনটি অনুভূতি একসঙ্গে মিলিয়া মনের সে এক অসহনীয় অবস্থা! সামনের একটা জলচৌকির উপর যন্ত্রচালিতের মত বসিয়া পড়ে। ন’কাকীমার কথায় কান নাই। মনে মনে মার উপর ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। সে না হয় দুপুরেই বাজার হইতে কাপড় ক’খানা কিনিয়া আনিয়াছিল; তাই বলিয়া বার-বাড়ীর আলমারীর মাথার এক কোণ হইতে চোরের

মত সেগুলি খুঁজিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইবে? এত বিশ্রী সন্দেহ তাঁর কোন্ সাহসে? না, সুনীল এই বাড়াবাড়ি সহ্য করিবে না কিছুতেই। কিসের ভয়? কাহাকে ভয়? মনে মনে আবার সে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে।

সুলতা বলিয়াই চলিয়াছেন, "ছেলে আগে মেয়ে দেখে পছন্দ করুক, তবে তো কথাবার্ত্তা। দিদিকে আমি তাই বল্‌ছিলাম। বাদলের মতো ছেলের ঘাড়ে তো আর যা-তা একটা গছিয়ে দিলে চল্‌বে না — দেখতে ভাল হওয়া চাই, ইংরেজীটাও একটু-আধটু জানবে, তোর মা আর ন'কাকীমার মত সেকেলে মেয়ে মানাবে কেন?—টাকা-পয়সার কথা হচ্ছে পরে। কী বলিস?"

আনমনা সুনীল ছোট একটা "হু" করিয়া ঘাড় নাড়ে। তাহার অন্য-মনস্ক ভাবটা টের পাইল শুধু অণিমা।

সুলতা কিন্তু উৎসাহিত হইয়া বলিতে থাকেন, "জানাশোনা ঘর থেকে মেয়ে আনতে হয়! নইলে, কী আনতে কী এসে হাজির হবে তার ঠিক কী! পরের টাকায় কে আর কত বড়লোক হয় রে, বাদল; কিন্তু যাকে নিয়ে সারা জীবন ঘর করতে হবে সে জিনিষটি দেখে শুনে বাজিয়ে আনতে হয়।"

"ন'কাকীমা আমি এখন উঠি।"

"সে কি! বস্ না আর একটু। তোর কাছে যে আমার অনেক কথা আছে," বলিয়া সুলতা মেয়েকে ডাকেন, "খুকী, ওঠ না।"

অণিমা সাড়া দেয় না।

"ওঠ না—উঠে এসে নতুন শাড়িখানা পরে তোর বাদলদার পায়ের ধূলো নে।"

মেয়ে তেমনি নির্ব্বিকার।

"উঠ্‌বি নে আজ?"—সুলতা কণ্ঠস্বর চড়াইয়া দেন।

"থাক্ না ন'কাকীমা। ওর বোধ হয় শরীর ভালো নেই।"

"শরীর খারাপ নয় আরো কিছু!—মাঝে মাঝে ওকে অমনি ভূতে পায়।"

অণিমা চুড়ির আওয়াজ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়।

"কানের মাথা খেয়েছিস?—শুনতে পাস্ না?" সুলতা ঝঙ্কার দিয়া ওঠেন।

"কী?"

"কী আর কী!—এই ভর সন্ধ্যেবেলা মানুষ নাকি বিছানায় শুয়ে থাকে। তোর ভালমন্দের ভয়ডরও নেই?"

নাই যে তাহা প্রত্যক্ষ। বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল ন'। ভাবিতেছে কত কি। বড়মার উপর অভিমানে ফুলিয়া উঠিতেছে। কি পাপ মন তাঁহার! নহিলে দুপুরবেলাই বা অমন কাণ্ড করিবেন কেন, আর সন্ধ্যার আগে—এই খানিক আগে রোজগারে ছেলের মা বলিয়া কি দেমাকটাই না দেখাইয়া গেল। অণিমারা না হয় গরীব আজ। তাই বলিয়া বড়মারই বা অত গুমর কিসের?

সুনীল এবার উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "ন' কাকীমা, দত্তবাড়ীতে মনোমোহন বাড়ুয্যের সঙ্গে দেখা হয়েছে—আমাদের হেডমাষ্টার মশায়।

তাঁকে তোমার স্কুলের কথা বললাম। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট থেকে সুরু করে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পর্য্যন্ত তাঁর জানাশোনা আছে বহু লোকের সঙ্গে। তিনি কথা দিয়েছেন, তোমায় গ্র্যাণ্ট পাইয়ে দেবেন।"

"বাদল, তোদের দয়ায়ই বেঁচে আছি বাবা। নইলে যার হাতে পড়েছি তার বুঝি কোনো হুঁস আছে!—রাত পোহালে হাঁড়িতে জল ফোটাতে হয় সে-ভাবনা আমি মেয়েমানুষ হয়েও আমাকেই ভাবতে হচ্ছে।"

অণিমা মনে মনে মায়ের উপর আবার ফোঁস করিয়া ওঠে। সুনীল না থাকিলে এখনি দু'কথা শুনাইয়া দিত সে। আবার সেই কাঁদুনি। কেবল কাঁদিয়াই জিতিতে চায়—তাই সারা জীবন কপালে শুধুই কান্না। অণিমা অপরের কাছে মাকে অমন কৃপাভিক্ষা করিতে দেখিলে সহ্য করিতে পারে না—কোথায় যেন বড় লাগে তার। এখন সে বড় হইয়াছে, বুদ্ধি হইয়াছে, মান-অপমান শোভন-অশোভনের বোধ জন্মিয়াছে।

সুনীলকে কণ্ঠন ধরিয়া উঠানটুকু পার করিয়া দিয়া সুলতা ঘরে ফিরিয়া আসিতেই অণিমা ধরা গলায় কহিল, "তুমি আর ওদের বাড়ী যেতে পারবে না।"

"কাদের বাড়ী?"

"নীলুদের বাড়ী"

"তোর কথায়?"

"হ্যাঁ, আমারি কথায়," অণিমা দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দেয়।

সুলতাও আর এক পালা মুখ ঝামটা দেন, "আমার পেটে তুই হয়েছিস, না তোর পেটেই আমি হয়েছি, শুনি?—তোর হুকুমে আমি উঠব আর বসব?"

"তুমি অমন যার তার কাছে মরাকান্না কাঁদতে বসো না!"

"হ্যাঁ রে আমার নবাবনান্দনী! মান দেখে মরে যেতে ইচ্ছে যায়। যেমন বাপ তেমনি তার মেয়ে।—থাক না তোরা, মান ধুয়ে ধুয়ে খা। আমি চলে যাব—যেদিক দু'চোখ যায়। আমি আর ওসব ইস্কুল-ফিস্কুলের হাঙ্গামার মধ্যে নেই। খাওয়া জুটবে কোত্থেকে দেখব'খন। তোর না হতেই যে তোদের চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধের হাঁড়ি না বসালে চলে না… আবার গুমর দ্যাখো!"

অণিমা বিছানা ছাড়িয়া নিঃশব্দে বারান্দায় আসিয়া বসে। মায়ের উদ্দেশ্য, বাদলদার অভিপ্রায়, বড়মার আক্রোশ—সবই সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই চক্র ঘুরিতেছে। ঘুরুক! আপত্তি নাই! কিন্তু বাদলদাকে সে যে এখনো ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই! অণিমার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতে চায় যদি, নমিতা সেনকে ভালবাসে না তবে? না, তার খেয়ালী মনের ঘোলাটে আবর্ত্তে নমিতা আর অণিমা দুজনেই অসহায় দুটি স্রোতের ভেলা? তার উদ্দেশ্য কি?—মনের শেষ কথাটি?

দুপুরবেলা বড়মার কাছে ধমক খাইয়া নানা কথার সঙ্গে এই প্রশ্ন-গুলি অণিমাকে পাইয়া বসিয়াছে। মনে মনে সঙ্কল্প করে, আর সে ও-বাড়ী যাইবে না। যাদের মনে অত কালি, তাদের সঙ্গে আবার সম্বন্ধ কি? কি কদর্য্য সন্দেহ বড়মার! তার ছেলে বারবার আসে কেন এ-বাড়ীতে? সে দোষও কি অণিমাদের?……

সাত

অণিমাদের বাড়ী হইতে সুনীলদের বাড়ী দুই মিনিটের রাস্তা। এই পথটুকুর মধ্যে সুনীল দাঁড়াইল বার তিনেক। মা যে কতখানি রুষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝিতে আর বাকী নাই। অণিমার শাড়ি আটপৌরে হইলে কি-ই বা ক্ষতি ছিল? অন্তত মার কাছে সে-ইচ্ছাটা আগেভাগে বলিয়া রাখিলে ব্যাপারটা এমন বিসদৃশ হইত না! ভুল হইয়া গিয়াছে।

যাক্, ঘটনাটা এমন কিছু নয়। দুদিনেই ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু আজিকার রাত্রি?—এই এখন? সময়টা অন্য কোথাও কাটাইয়া মা ঘুমাইয়া পড়িলে পর বাড়ী ফিরিলেই তো সকল হাঙ্গামা চুকিয়া যায়। আজকের রাতটা তো বাঁচে। কালের কথা কাল। বারো ঘণ্টা ঘুমাইয়া উঠিয়া মার অভিমান অনেকটা কমিবে, ছেলেরও সাহস কতকটা বাড়িবে। অতএব আর ঘণ্টা দুই পূজাবাড়ীতে আরতি দেখায় আপত্তি কি?—সেখানে ঠাকুরদাদা, নীলু ও বাবলু আরতি দেখিতে গিয়াছে, সকলে মিলিয়া একসঙ্গে বাড়ী ফিরিবে।

আবার ভাবে, মা এখন একা—এই উপযুক্ত সময়। রাত্রিবেলা যে-জিনিষটা কঠিন বোধ হইতেছে কাল দিনের আলোয় তাহা আরো কঠিন মনে হইবে। যাহা হইবার এখনই হইয়া যাক্। আর হইবেই বা এমন কি! মার অভিমান কেমন করিয়া জল করিয়া দিতে হয় সে-কৌশল সে জানে। দুমিনিটেই আবার যে কে সেই।

সুনীল বড় ঘরের দুয়ারে আসিয়া আস্তে আস্তে আঘাত করে। ভিতর হইতে মন্দাকিনী সুধাইলেন, "বাবা এসেছেন?"

"না মা, আমি"।

নিবু-নিবু হারিকেনটা চড়াইয়া দেওয়ায় দুয়ারের বাহিরে আসিয়া আলো পড়িল। মা দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিতেছেন।

সুনীলের কলিকাতার বন্ধু ও পরিচিতের দল যদি এসময় উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে হাসির অপেক্ষা তাদের বিস্ময়ই হইতে বেশি। স্পষ্টভাষী সুনীল; কাহাকেও ভয় করিয়া সে কথা কয় না; মেসের আড্ডায়, কার্জ্জন পার্কের আলোচনায়, আপিসের গল্প-গুজবে তার শানানো কথার দাপটে সকলেরই তাক লাগে; তর্ক-বিতর্কে দুর্জ্জয়; সমালোচনায় দুর্ম্মুখ; গান্ধী হইতে গঙ্গারাম আর হিটলার থেকে টম-হ্যারী সকলকেই নাকি সে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে জর্জ্জরিত করে। কলিকাতার বন্ধু মহলের এই সর্ব্বজনস্বীকৃত বাক্যবীরটি আজ এখন ভিজা বিড়ালের মত দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

মন্দাকিনী দুয়ার খুলিলেন।

সুনীল দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া নিজের বিছানায় গিয়া বসে। মার সঙ্গে কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে ভাবিয়া পায় না। যতটা সহজে

কাজ হাসিল করিবে মনে করিয়াছিল এখন দেখে তাহা তত সুসাধ্য নয়; সুযোগ খুঁজিয়া পায় না।

মন্দাকিনী নীরবে নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুনীল হঠাৎ প্রশ্ন করে, "মা, নীলুরা এখনো আরতি দেখে ফেরে নি?"

ঐ চৌকি থেকে কোন জবাব আসিল না। নীলুরা যে আসে নাই সে তো প্রত্যক্ষ ব্যাপার। ইহার আবার উত্তর কি? সুনীল একটা আস্ত আহাম্মুক!

খানিক বাদে আবার ডাকিল, "মা"!

"কেন?"—মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বর ভারী।

"তোমার কি আজ শরীর খারাপ?"

"না।"

"তবে শুয়ে আছ কেন?"

এ-কথারও কোন জবাব নাই!

খানিক নীরব থাকিয়া সুনীল এবার ফস করিয়া বলিয়াই ফেলে "অনুদের কাপড়গুলো দুপুরেই কিনে এনেছিলাম। —বাজারে যেতে যেতে ভাবলাম, [illegible] তো শুনেছি অনুর নাকি কোথাও বেরুবার মতো ভাল কাপড় নেই। তাই ওর শাড়িখানা একটু ভালো দেখে এনেছি। কাই বা দাম!"

মার দিক হইতে তবু কোন জবাব নাই। কাছে যাইতে ছেলেও ভরসা পায় না! বুঝিল, মেঘ কাটিবার সময় এখনো আসে নাই। আপাততঃ বিষয়টা মুলতুবী রাখাই সঙ্গত। কাল আবার দেখা যাইবে।

সুনীল বালতির জলে পা ধুইয়া শুইয়া পড়িল। বেশ একটু গরম বোধ হইতেছে। মাথার কাছের জানালাটা খুলিয়া দেয়।

দত্ত-বাড়ী আরতির বাজনা বাজে।

মা আর ছেলে দুজনেই চুপচাপ। দু'বিছানায় দুজনে চোখ বুজিয়া ভাবিয়া চলে যার যার কথা। ভাগ্যিস পূজাবাড়ীর ঢাকের আওয়াজে সারা গ্রাম সরগরম। নহিলে নির্জ্জন ঘরটা মনে হইত আরও অসহ্য।

কিসের ভয়? ঘণ্টা দেড়েক এপাশ ওপাশ করিয়া সুনীল বিছানার উপর উঠিয়া বসে। কেন ভয়? আচ্ছা, না হয় ধরিয়া লওয়া যাক্— মার সন্দেহটা অমূলক নয়। তাহাতে মার এত রাগ কেন? অণিমার উপর ছেলের আকর্ষণ টের পাইয়া থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা খুশী হইবার কথা তো তার জননীরই। যে-মা আজ চার বছর এত চেষ্টা করিয়াও তাঁর ছেলেকে বিবাহে রাজী করাইতে পারেন নাই, পুত্রবধূ ঘরে আনিবার জন্য ছেলের একটা কথা আদায়ের জন্য যে-মা নাকি উদ্গ্রীব হইয়া আছেন রাতদিন—তাঁহার সেই অকপট আকাঙ্ক্ষার সহিত এই অভিমানের মিল কোথায়? ছেলের ইচ্ছাই যদি মার ইচ্ছা, তার পছন্দই যদি সকলের পছন্দ, তবে এই বিরোধ কেন? অণিমা কুশ্রী নয়, কুঁড়ে নয়, এক গোত্রও নয়, গ্রাম সম্পর্কে বোন ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে মা-ছেলেতে এই ঠোকাঠুকির অর্থ কি? ছেলের মতামত তবে একটা কথার কথা? এই সহজ কথাটা মা বোঝেন না কেন, তাঁর রোজগারে ছেলের জেদ চাপিলে মা আর ঠাকুরদা—সারা দুনিয়ার আপত্তির বিরুদ্ধেও সে অণিমাকে এ বাড়ীর বধূ করিয়া আনিতে পারে অনায়াসেই?

মা কেন এমন ক্ষেত্রে শেষরক্ষার ব্যবস্থা করিতে সানন্দে আগাইয়া যান না?

ঘণ্টা দুই চলিয়া যায়। মা টের পান, ছেলে ঘুমায় নাই; ছেলেও জানে, মা জাগিয়াই আছেন। ঠাকুরদা বহুক্ষণ হয় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ওঘর থেকে তাঁর হুঁকার আওয়াজ আর শোনা যায় না। নীলু আর বাবলু এখন বেহুঁস ঘুমে।

"মা!"

জবাব নাই।

"বড় গরম পড়েছে আজ।"

সায় দেয় না কেহ।

সুনীল পাশ ফিরিয়া শোয়। খাণিকক্ষণ পরে তরল সঙ্কোচের উপর ধীরে ধীরে অভিমানের উত্তাপ লাগে। অভিযোগের বাষ্প উঠিয়া মস্তিস্কের গলিঘুঁজি আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। একটা অব্যক্ত অন্ধ ক্রোধ ঘুরপাক খাইতে থাকে। এমন বিশ্রী সন্দেহ কেন? দুপুরে অমন করিয়া চোখ রাঙাইবার কারণ কি? কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়াছে? ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না, এতই অপরাধ সুনীলের? সেও পাল্টা জবাব দিতে জানে—জননীর প্রতিটি অশিষ্ট আচরণের যোগ্য প্রত্যুত্তর।

এ চৌকিতে মা। ঐ বিছানায় ছেলে। আরও ঘণ্টাখানেক নিঃশব্দে কাটিয়া যায়। দত্ত বাড়ীর ঢাকঢোল থামিয়াছে। দূরে দূরে ভিন গাঁয়ের দু'একটি আরতির বাজনা রাত্রের অন্ধকারে গমগম করিয়া ভাসিয়া আসে। মা ও ছেলে কাহারো চোখে ঘুম নাই। মাঝে মাঝে টিনের

চালে পাশের বেলগাছটা তার প্রসারিত শাখা বুলায়, আর ওঘরে ব্রজনাথ দত্তের নাক ডাকে।

মশার কামড়ে উত্যক্ত হইয়া মন্দাকিনী উঠিয়া বসিলেন। এতক্ষণে হুঁস হয়, আজ মশারি ফেলেন নাই ; ছেলে-মেয়েকে মশায় কামড়াইয়া শেষ করিল। বাতিটা চড়াইয়া দিয়া মশারি পাড়েন। তারপর নিঃশব্দে উঠিয়া আসিলেন পুত্রের বিছানায়।

সুনীল চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। মন্দাকিনী পাখা লইয়া খানিকক্ষণ সশব্দে বাতাস করিয়া মশা তাড়াইলেন। তারপর মশারি ফেলিয়া বিছানার চারিপাশ ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিলেন।

সুনীলের শিয়রের জানালাটা খোলা ছিল। মন্দাকিনী বন্ধ করিয়া দেন। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়। প্রথম রাত্রে গরম বোধ হইলেও শেষ রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। সুনীলের পাশ-বালিশটা অনাদরে দূরে পড়িয়া আছে। মন্দাকিনী মশারির মধ্যে হাত গলাইয়া সেটা সুনীলের কাছে টানিয়া দিলেন। আস্তে আস্তে পুত্রের স্খলিত ডান হাতখানি পাশ বালিশের উপর রাখিয়াই তাড়াতাড়ি মশারির প্রান্তটুকু বেশ করিয়া গুঁজিয়া দিলেন যেন ফাক পাইয়া মশা ঢুকিতে না পারে। তারপর ফিরিয়া গেলেন নিজের বিছানায়।

রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে সুনীলের জল খাইবার অভ্যাস আছে। বিছানার কাছেই জলচৌকির উপর জলের গ্লাস রাখিতে মন্দাকিনী আজ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মনে পড়িতেই আবার উঠিয়া আসিলেন। যথাস্থানে জল রাখিয়া তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া যান নিজের বিছানায়।

পুত্র জাগিয়াই আছে। টের পায় সব কিছু অনুভব করে জননীর, প্রতিটি সস্নেহ আচরণ। তবু মড়ার মত চুপ করিয়া পড়িয়া আছে—যেন কত ঘুমই না ঘুমাইতেছে!

"এই নীলু! ঠিক হয়ে শো," অন্ধকারে মন্দাকিনীর ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বর বাজিয়া ওঠে, "কেমনতর শোওয়া তোর?— মশারিটা ছিঁড়ে পড়বে সকল গোষ্ঠির গায়। মেয়েকে একদিন বললে হুঁস হয় না—রোজ রোজ টেনে এনে বালিশে মাথা ঠিক করে দিতে হবে! শত্তুর ধরেছি পেটে—নইলে এত ভোগ কার কপালে লেখা থাকে!"

সুনীল এই বাঁকা কথার লক্ষ্য কে তা বেশ বোঝে। মা তবে টের পাইয়াছেন—ছেলে এখনো ঘুমায় নাই! বুঝিলেনই বা। কি এমন চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছে সে?......

"ছ্যাখো, মেয়ে আবার পায়ের তলায় এসে পড়েছে।—তোদের জাতের স্বভাব! ডাইনে বললে বাঁয়ে যাস্।" মন্দাকিনী আর এক প্রস্ত প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ করেন!

পুত্র অন্ধকারে মশারির মধ্যে উঠিয়া বসিয়া আছে। ঘুম আসে না ...অণিমা অভিমান করিয়া শুইয়াই রহিল—নকাকীমার অত কথায়ও একবার উঠিয়া আসিল না! আসিবে কেন? মার দুপুরের ঐ কাণ্ডের পর অভিমান করা অন্যায় কি? সেই অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারটা হালকা করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেই তো সুনীল সন্ধ্যার পর অণিমাদের ওখানে গিয়াছিল। গিয়া দেখে, মা সহজ বিষয়টাকে আরও ঘোরাল করিয়া আসিয়াছেন। হয় তো আকারে ইঙ্গিতে এমন সব কথাও বলিয়া আসিয়াছেন যার জন্যই অণিমা লজ্জায় সুনীলের কাছে

সহজভাবে উঠিয়া আসিয়া কথা বলিতে পারে নাই। অণিমার কি দোষ? গরীব বলিয়া কি তার মান-অপমান বোধও থাকিবে না? মা এমন অশিষ্টতা কবে হইতে শিখিল?

নিঝুম নিশীথ পল্লী। শুধু টিনের চালার পাটাতনে টুকটাক শব্দ—ইঁদুরের অবাধ আনাগোনা। চৌকির তলে ঘুমন্ত বিড়ালের গলায় ঘড়ঘড় আওয়াজ।

আর কথা বলে পদ্মা। মনে হয় নদী যেন বিছানার কাছ ঘেঁষিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

সুনীল হাত বাড়াইয়া শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দেয়। এক ঝলক স্তিমিত জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে মশারির মধ্যে। গরাদের ফাঁকে ফাঁকে নজরে পড়ে দীর্ঘ নারিকেলগাছের আবছায়া মগডাল—জ্যোৎস্না করে চিকমিক। বেলগাছটা তির তির করিয়া পাতা নাড়ে। মাঝে মাঝে হালকা বাতাসে মশারির প্রান্তও একটু কাঁপিয়া কাঁপিয়া যায়।

মা বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন?……

সুনীল বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। মনে হয় খানিক খোলা হাওয়ায় ঘুরিয়া আসিলেই ঘুম আসিবে।

আস্তে আস্তে দুয়ার খুলিয়া সুনীল উঠানে আসে। ও-ঘরের বারান্দা থেকে বেতের মোড়াটা আনিয়া উঠানের মাঝখানে বসিয়া পড়ে। চারিদিকে অন্ধকার নামে ধীরে ধীরে—স্তরে স্তরে। সবে অষ্টমী—পূর্ণিমার এখনো অনেক বাকী। ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকের ধুকধুক যেন কান পাতিয়া শোনা যায়। যেন হাত বাড়াইলেই হাতে মিলে ধরিত্রীর পরিশ্রান্ত মনখানি।

বসিয়া বসিয়া ভাবে সুনীল—অনেক কথা, অনেক অ-কথা। ঘনায়মান অন্ধকারে মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছে এবার—খানিকটা খোলা হাওয়া পাইয়া বিক্ষুব্ধ মন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। এতক্ষণ মনের উপর ঘন ঘন চলিয়াছে নানা দৃশ্যের পালাবদল—কখনো শঙ্কা, কখনো সঙ্কোচ, কখনো রাগ, কখনো অভিমান। কি অদ্ভুত মানুষের মন। বাড়ী আসিয়াছে এখনো তো পুরা চব্বিশ ঘণ্টা হয় নাই। ইহারই মধ্যে মনের মধ্যে কত ভীড়, কত কাড়াকাড়ি, কি না ঠেলাঠেলি। অস্বীকার করিয়া লাভ নাই—বকুলতলা আর কলিকাতায় প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। তার মনের আকাশে দুদিক থেকে দুখানি ঘুড়ি সূতা ছাড়িয়া চলিয়াছে অবিরাম। আজ হউক কাল হউক, একখানাকে৷ কাটিয়া খসিয়া পড়িতেই হইবে। নমিতা না অণিমা? অথবা—হয় তো বা—বিদায় লইতে হইবে দু'জনকেই।

সুনীল চমকাইয়া ওঠে। ঢেঁকি ঘরে বাঘা ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিয়াছে। কুকুরটা শেয়ালের সাড়া পাইয়াছে বুঝি?

নমিতা বা অণিমা যে-ই হউক, মায়ের কাছ হইতে সে যে আজ অনেকখানি দূরে সরিয়া পড়িয়াছে সে-কথা অস্বীকার করিবার মত মনের জোর কৈ? সরিয়া পড়িতে হয় সেই তো নিয়ম। কিন্তু এতখানি? মায়ের উপর আগেকার সেই সহজ টানটা এখন আর নাড়ীর যোগ নয়, দড়ির? মায়ের ভাবনটা আজ বুক ছাড়িয়া মস্তিষ্কে উঠিয়াছে? তাই বুঝি পদে পদে ভাবিয়া চিন্তিয়া ওজন করিয়া ছেলের কর্ত্তব্য বজায় রাখিতে হয়। মায়া নয়, শুধুই দয়া? একটা দায়? 'উচিত', 'সঙ্গত' 'না করিলে নয়' 'মনে ব্যথা পাইবে'—

এমনধারা যুক্তি বুদ্ধির দোহাই ওঠে কেন? বারো মাসের কলিকাতায় মায়ের অভাব সে আর তেমন অনুভব করে কৈ?...মায়ের কূলে ভাঙন ধরিয়াছে! আজ এখন গভীর রাত্রে এই যে-একটু উদ্বেলতা, হয় তো একটু হা-হুতাশ—তা-ও ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্খা নয়—অতীতের দিকে চাহিয়া, অনেক কথা স্মরণে আনিয়া, একটুখানি ঐতিহাসিক আসক্তি শুধু!

"খোকা!"

সুনীল পিছন ফিরিয়া তাকায়। অন্ধকারে মা আসিয়া দাওয়ার উপরে দাঁড়াইয়াছেন।

খোকা! এই আকাশে-বাতাসে ঘরে-বাহিরে আনাচে-কানাচে আশৈশব কতভাবে কত বারের ঐ ছোট্ট ডাকটি যেন এক সঙ্গে প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া ওঠে এই নিঃসাড় মধ্যরাত্রে!

"এত রাত্তিরে বাইরে বেরিয়েছিস! বসে বসে ভাবছিস কী?" মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

"ঘুম আসছে না মা। তাই একটু বাইরে এসে বসেছি।"

"উঠে আয়। অসুখ করবে।"

বলিতে না বলিতে একান্ত বাধ্য ছেলে উঠিয়া ঘরে আসে। মন্দাকিনী দুয়ারে খিল দিয়া নিজের বিছানায় যাইতেছিলেন, সুনীল মশারির মধ্য হইতে ডাকিল, "মা আমার মাথায় খানিক হাত বুলিয়ে দাও। ঘুম আসছে না।"

মন্দাকিনী মশারির মধ্যে ঢুকিয়া ছেলের চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে থাকেন।

"মা!"

"বল্"

"তুমি রেগেছ?"

"রাগব কেন?"

"হ্যাঁ, তুমি রেগেছ?"

মন্দাকিনী নীরব।

বাহিরে কুকুরটা কিছু একটা দেখিয়া আবার ঘেউ ঘেউ করিয়া ওঠে। সুনীল আস্তে মার একখানি হাত বুকের কাছে টানিয়া নেয়, "তুমি ভুল বুঝো না। আমার কাছে তোমার চেয়ে কেউ বড়ো হতে পারে না—এ সংসারে কেউ না।"

"তুই এখন ঘুম্ দিকিনি।"

"আগে বলো, তুমি রাগ করো নি?"

মন্দাকিনী অন্ধকারে একটু মৃদু হাসিলেন; "ছেলের কথা আমি আবার রাগলাম কখন।"

সুনীল নিশ্চিন্ত হয়। তার এত বড় কঠিন ব্যাপারটা এত সহজ হইয়া গেল! মার কাছে এমনি হয়।—এতক্ষণে হইত-ও, শুধু হইয়া উঠিতে পারে নাই নিজেরই অকারণ কুণ্ঠায়।

"মা। আমি তো লক্ষ্মীপুজোর পরদিনই যাব। তার আগে সেই মেয়েটিকে দেখে আসি। কী ব'লো?"

"তুই এখন ঘুমো তো!—রাত কত সে-খেয়াল আছে?"

"আজ আমার ঘুম আসছে না কেন মা?"

"আসবে'খন। চোখ বুজে চুপ করে থাক।"

সুনীল চোখ বুজিয়া চুপ করিয়াই থাকে। মা তাহার গায় মাথায় বার বার হাত বুলাইতে থাকেন। মার এই মায়া, এই আদর, এই শুশ্রূষা—ভাল লাগে। সব চেয়ে ভাল লাগে সেই ছোট্ট ডাক—'খোকা' কি বেয়াড়া মন তবু! জননীর সস্নেহ করতলের স্পর্শসুখ উপভোগ করিতে করিতে ছেলে কিন্তু ইহারই মধ্যে বার কয়েক ভাবিয়া লয় নমিতার মুখের আদলটা, অণিমার বামগণ্ডের ছোট তিলটুকু; কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘুরিয়া আসে বালীগঞ্জে—নমিতার পড়ার ঘরের দক্ষিণের জানালায়; এক মিনিটের মধ্যে এক সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় অণিমার সম্পর্কে অসংখ্য খুঁটিনাটি—এমন কি, আজ সন্ধ্যাবেলায় বিছানার উপরে অভিমানিনীর আটপৌরে কাপড়খানার পাড়টা পর্যন্ত সুনীল মুখস্থ বলিয়া যায়।

"খোকা ঘুমিয়েছিস?"

ছেলে ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকে।

"খোকা!"

সুনীল পাশ বালিশ আঁকড়াইয়া তেমনি পড়িয়া আছে। মন্দাকিনী আস্তে আস্তে বাহিরে আসেন। মশারির ধার গুঁজিয়া দেন অতি সন্তর্পণে। তারপর ফিরিয়া আসেন নিজের তক্তপোষে।

নীলু আবার কুকুরকুণ্ডলী হইয়া বিছানার একপাশে আসিয়া পড়িয়াছে। বাবলুর মুখটা পাশ বালিশ আর মাথার বালিশের মাঝখানে আটক পড়িয়াছে।

মন্দাকিনী ছোট-ছেলেকে ঠিক করিয়া লইয়া তাকে কোলের কাছেটানিয়া নেন। ঘুমন্ত বাবলু মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া অঘোরে ঘুমাইতে থাকে।

অন্ধকারে মন্দাকিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া যান। ...এ কি অপ্রতিরোধ্য প্রবাহ! সারা দুনিয়ায় কেবল দুর্নিবার হওয়া আর হইয়া-ওঠা।......

শঙ্কিত জননী কোলের ছেলের মাথাটা নিবিড় করিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরেন। চাপিয়া ধরিতে চাহেন ভবিষ্যতের এক স্বয়ংস্বতন্ত্র পরিপূর্ণ মানুষকে? না, মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীলতার নাগালের মধ্যে কল্পনায় বাঁধিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন বাইশ বছর আগের এমনি এক অসহায় শিশুকে—যার নিখুঁত অভিনয়ের ফাঁকটা তিনি খানিক আগেই ঐ-বিছানা হইতে টের পাইয়া আসিয়াছেন?

আট

পরদিন।

সকাল হইতেই মাতা-পুত্রে কথা নাই। সুনীলকে দেখিলেই মন্দাকিনী চোখের পাতা নামায়, মার মুখোমুখি পড়িয়া গেলে ছেলেও সলজ্জভাবে পাশ কাটাইয়া যায়। কাল রাত্রের এমন একটা মীমাংসার পরেও আজ কেন যে এই অস্বাভাবিক আচরণ সে কথা সুনীল শুইয়া বসিয়া কেবলি ভাবিতে থাকে। অপরাধটা কার? তার না মার? কাল রাত্রিবেলা সে তো মার কাছে মনের কথা খোলসা করিয়াই বলিয়াছে। এখনো তবে অভিমান কেন?

সুনীলেরও বা এমনধারা সঙ্কোচ কেন? ভোরে উঠিয়া মার কাছে একটিবারও যায় নাই—ডাকে নাই, খাইতে চায় নাই। বেলা আটটা পর্য্যন্ত বাইরের ঘরেই কাটাইয়া দিল। এক থালা লাড়ু আর মোয়া আসিয়াছে নীলুর হাতে, চায়ের পেয়ালা দিয়া গেল বাবলু। মার এই উপেক্ষা কেন? অভিমানে ফুলিতে থাকে সন্তানও।

বেলা বাড়ে। স্নানের সময় হয়। খাইবার ডাক আসে আবার নীলুকে দিয়া। রান্নাঘরে নিঃশব্দে আহার শেষ করিয়া সুনীল উঠিয়া পড়ে। আর কিছু চাই কিনা সেই প্রশ্ন যাহাতে না করিতে হয় তারই জন্য আলাদা এক একটা বাটিতে মন্দাকিনী বেশী বেশী মাছ ডাল তরকারী রাখিয়া সেই যে হেঁশেলে ঢুকিয়াছেন আর কাজ সারিয়া বাহিরে আসিলেন পুত্র মুখ ধুইয়া বার-বাড়ীতে চলিয়া যাওয়ার পরে। নির্ব্বাক ছায়াচিত্রের অভিনয়ের মত মা-ছেলের কাহারো মুখে টু-শব্দটি নাই।

ঘণ্টা দুই বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া সুনীল উঠিয়া বসে। ......অণিমা আজ আসে নাই। কেন আসে নাই সুনীল তাহা বেশ জানে। না আসাই উচিত।

বার কয়েক আর-ওদের-বাড়ী-যাইব-না সঙ্কল্প করিয়া অবশেষে যে-যা-বলে-যাইবই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া সুনীল জামাটা পরিয়া লইতে উঠিয়া আসে বড় ঘরে।

মা ঘরে নাই। নীলু আর বাবলু পুতুল খেলায় ব্যস্ত।

"মা কোথায় রে নীলু?"

"কি জানি।" বলিয়াই বোন ছোট ভাইটির মুখের দিকে তাকায় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

মা কোথায় গিয়াছেন নীলু যে তাহা জানে সে-কথা আর চাপা থাকে না।

"বাবলু, মা কোথায় গেছে জানিস্?"

বাবলু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসে।

"বল না?"

"আমি বুঝি জানি ?"

"জানিস্ তুই—বল।" ধমক দেয় সুনীল।

"মা পলাছডাঙ্গা গেছে।"

পলাশডাঙ্গা এ গ্রাম হইতে মাইল দুই দূরে। আজ পূজার দিনে নীলু আর বাবলুকে বাড়ী রাখিয়া মার হঠাৎ পলাশডাঙ্গা ছুটিবার কি প্রয়োজন পড়িল পুত্র তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

"কেন গেছে ?"

"আমরা তার কি জানি।" জবাব দিল নীলু।

"থাম তুই।—যাকে বলছি সে-ই উত্তর দিক।"

ধমক খাইয়া নীলু চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মা বার বার বলিয়া গিয়াছেন, কোথায় যাইতেছেন সে কথা দাদা যেন জানে না। বাবলুকেও দু' আনার পয়সা ঘুষ দিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া বাড়ী রাখিয়া গিয়াছেন বহু কষ্টে।

"পলাশডাঙ্গা কেন গেছে জানিস্ ?"

বাবলু ঘাড় নাড়ে।

"কার সঙ্গে গেছে ?"

"মানা'র মা।"

মানার মা অর্থাৎ মানদা। ত্রৈলোক্য দাসের দুস্থা বিধবা স্ত্রী। সুনীলদের বাড়ীর ঝি বলিলে সে আপত্তি জানায়। বাসন মাজে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে, ঘরদোর ঝাট দেয়, সারাদিন সংসারের আরো অনেক কাজ করিয়া দেয়। পরিবর্তে দু' বেলা দুজনের আন্দাজ ভাত বাড়িয়া বাড়ী লইয়া যায়। আর পূজার সময় পায় এক জোড়া করিয়া

সাদা থান। একমাত্র সন্তান বিধবা কুমুদ তার ঘাড়ে। সেও মাঝে মাঝে এ-বাড়ী ও বাড়ী ধান ভানার কাজে যায়।

অবসর সময় মানদা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। সকলকার ঘরোয়া কথা কুড়াইয়া আনিতে সে অতি পাকাপোক্ত লোক। এই কয়দিন মন্দাকিনীর অনুমতি লইয়া দত্তবাড়ীর পূজার কাজে খাটিয়া দিতে গিয়াছিল। তবু মাঝে মাঝে আসিয়া মন্দাকিনীকে অণিমা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া গিয়াছে। সুনীল অণিমাদের বাড়ী কবে কখন কতক্ষণ কাটাইয়াছে সে-খবর দুনিয়ার আর কেহ না জানুক মানদা নাকি সঠিক জানে।

মানদাকে সুনীল কোনদিনই দেখিতে পারেনা! পরের কুৎসা রটনা করিতে রসনা তার লকলক্ করে চিরকাল। এ-হেন মানদার সঙ্গে মার পলাশডাঙ্গা যাওয়ার মধ্যে আপাতত কোন শঙ্কার কারণ ভাবিয়া না পাইলেও সুনীল একটু অশ্বস্তি বোধ না করিয়া পারে না।

খানিক বাইরের ঘরে কাটাইয়া সুনীল আবার অণিমাদের বাড়ীর উদ্দেশে উঠিয়া দাঁড়ায়। নিশ্চয় যাইবে। এক-শ' বার যাইবে। মার এই বাড়াবাড়ি অসহ্য। অত অহঙ্কার ভাল নয়। জননীর এই স্পর্দ্ধিত অভিমানের উপর পাল্টা আঘাত করিবার কল্পনায় সুনীলের মনের তলে কেমন যেন একটা বোবা উল্লাস মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। পরক্ষণেই হঠাৎ জাগা গাঁজলা আবার মিলাইয়া যায় সজ্ঞ সচেতন মনে।

না-না, অণিমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসিবে মাত্র। মা-ও প্রকৃতিস্থ হইবেন। অণিমাও ভুল বুঝিবে না। দুদিনের জন্য বাড়ী আসিয়া দুই পরিবারের মধ্যে এমন একটা মনোমালিন্য সে

কিছুতেই ঘটিতে দিবেনা। অণিমার কাছে এখন সেই শুভ উদ্দেশ্য লইয়াই তো যাইতেছে! মা ফিরিয়া আসিলে অকপটে হাসিয়া হাসিয়া কহিবে—আগাগোড়া ব্যাপারটা তিনি ভুল বুঝিয়াছেন।···কিন্তু মা হঠাৎ দুপুরবেলা পলাশডাঙ্গা গেলেন কি জন্য?

মন্দাকিনী কোথায় এবং কেন যাইতেছেন সে খবর সারা দুনিয়ায় জানেন শুধু তিনি; আর জানে মানার মা। আসলে পলাশডাঙ্গা নয়, তারই পাশের গাঁয়ে—বেলপুকুরের যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী। বেলপুকুরের যদু চক্কোত্তিকে চিনে না এমন লোক এই পরগণায় কেহ নাই। তিনি জমিজমার মালিক নন, ব্যবসায়ীও নন, তাঁহার তিনপুরুষে কেহ কোন দিন চাকুরীও করেন নাই। তবু তিনি বেশ দু'পয়সার মালিক। তাঁহার স্বর্গত পিতা নাকি প্রত্যক্ষ কালী দর্শন করিয়াছিলেন। সিদ্ধ পুরুষ মৃত্যুকালে পুত্রকে দু'চারটা গুপ্ত মন্ত্র কোন্ আর না দিয়া গিয়াছেন—অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, এমন কি বহু শিক্ষিত লোকও এই ধারণার বিরুদ্ধে কোন বক্রোক্তি শুনিলে বিরক্ত হইয়া ওঠেন।

যদু চক্কোত্তির প্রকাশ্য ব্যবসা—লোকের হাত দেখিয়া ভবিষ্যতের ভাল মন্দ ফলাফল বলিয়া দেওয়া এবং নানা আসন্ন অমঙ্গল ও নিশ্চিত ফাঁড়া কাটাইবার হোম-যাগ যজ্ঞাদির অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা। আর তাঁহার প্রাইভেট ব্যাবসার কথাটাও সকলেই জানে। তবু থানার দারোগা হইতে আরম্ভ করিয়া হাই-স্কুলের হেড-মাষ্টার মশায় পর্যন্ত জানেন না কেহই। বৃদ্ধ চক্কোত্তি মশায় বিধবার বিপদুদ্ধার করেন, কুমারীর মুখ রক্ষা করেন, দুরন্ত স্বামীকে অভাগী স্ত্রীর বশে আনিয়া দেন, ভেড়া পুত্রকে বাঘিনী পুত্রবধূর কবলমুক্ত করেন—একাধারে এমন স্বার্থ ও পরার্থের

চর্চ্চা করিয়া তিনি এই অঞ্চলে চৈত্র-মাসের কলেরার সময় সরকারী ডাক্তারবাবুর অপেক্ষাও অনেক বেশী জনপ্রিয়। এ-হেন যদু চক্কোত্তির বাড়ী যাইবার পথে মন্দাকিনী এখন বার বার মানদার বুদ্ধি, বিবেচনা ও হিতাকাঙ্খার জন্য মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছেন! সুলতা যে তুকতাকের সাহায্যে ছেলেকে তাঁহার বশ করিবার চেষ্টায় আছে সে-সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! মেয়েকে দিয়া নিশ্চয় তাঁহার খোকাকে গুণ করাইয়াছে।

এদিকে সুনীলও ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে অণিমাদের বাড়ী মা পলাশডাঙা হইতে কমসে-কম দুই ঘণ্টার আগে ফিরিতে পারিবেন না। পুত্র একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া লয়। ঘণ্টা দুই। বেশী হইতে পারে। নিশ্চিন্ত।

মাঝপথে মূর্ত্তিমান বাধা আসিয়া দাঁড়ায় নন্দ দাস।

"কী খবর নন্দ দা?"

"তোমায় আজ একবার আমাদের বাড়ী যেতে হবে।"

"কেন?"

"তোমার বৌদির যত সব—ইয়ে। ক্ষীরের নাড়ু তৈরী করে তোমার জন্যে।"

সুনীল এই সাদর আমন্ত্রণের আসল উদ্দেশ্য বুঝিল। হাসিয়া এক মিথ্যা কথাই কহিল, "আজ তো যাওয়া চলবে না নন্দ দা। ভাত খা নি—জ্বর হয়েছে। নাড়ু খাব কেমন করে?"

"তবে কাল সকালে যাবে?"

সুনীল তার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসে—কৌতুকের হাসি

নন্দদাস আচ্ছা ঘোড়েল। এবার অবস্থা বুঝিয়া চিরদিনের সহজ উপায় ছাড়িয়া বাঁকা পথ ধরিয়াছে। মুচকি হাসিয়া কহিল সুনীল, "চলো। আজই খাব। দু'একটা নাড়ু খেলে কিছু হবে না।"

পথে নন্দ দাস অনেক কথাই শোনায়। বাদলের মত এমন ছেলে আশে-পাশে দশটি গ্রামে একজনও নাই; সারা বছর তারা সবাই পূজার ছুটির দিন গুণিতে থাকে—কবে আবার বাদল আসিবে; ইত্যাদি।

সুনীল কিন্তু চুপ করিয়া শুনিয়া যায়। এবার ভবী ভুলিবার নয়। হাতের টাকা তো সব ফুরাইয়া আসিয়াছে। থাকিলেও এবার দিত না সুনীল। সে কি এতই বোকা যে, নন্দদাসের মিষ্ট কথায় গলিয়া পড়িবে?

বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই নন্দ হাঁক দেয় "বুঁচি, তোর মা কৈ রে?—বাদল এসেছে। একটা পিঁড়ি নিয়ে আয় শিগ্‌গির!"

বুঁচি বারান্দায় পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া বাদলের পায়ের ধূলা লইল।

নন্দ আবার হাঁক দেয়, "তোর দিদি কোথায়? টেপি গেল কৈ? ওরে ক্যাবলা!—সবাইকে এসে পেন্নাম করতে বল বাদলকে!"

নন্দর হাঁকডাকে ছবি দুয়ারের ওপিঠে আসিয়া লজ্জায় দাঁড়াইয়া আছে। নন্দর স্ত্রী ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিল, "মেয়ের লজ্জা গ্যাখ। পেন্নাম করে আয়। বাদল কাকাকে আবার লজ্জা কিসের"

ছবি আসিয়া বাদলের পায়ের ধূলা নিল।

নন্দর স্ত্রী হাসিয়া কহিল, "তুমি এসেছ ঠাকুর-পো, তোমার জন্যে—"

"জর আমার—দুটি নাড়ু শুধু মুখে দেব।"—নাড়ুর উল্লেখ শুনিয়া নন্দর রোগা লিকলিকে ছোট ছেলেটা ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়াদাঁড়ায়। শ্রীমান ক্যাবল তো আগেই আসিয়া দূরে বসিয়া সুনীলকে

একদৃষ্টে দেখিতেছে। ঘরের মধ্যে কোলের ছেলেটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে। বুঁচি তাকে কোলে লইয়া বারান্দায় আসে। আরো দুটি আছে। তারা এখন দত্ত বাড়ী অথবা অন্য কোথাও।

সুনীল একবার ছবি ও টেঁপিকে দেখিয়া লইল। ওদের সে মায়ের কোল হইতে দেখিয়া আসিতেছে। তবু সরলভাবে তাকাইতে আজ লজ্জা করে। কি সর্ব্বনাশা বাড়! দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠিয়াছে অসম্ভব। বয়সটা কি দু'বেলা দু'টি ডাল-ভাতেই চাপা দেওয়া যায়? ছবি ও টেঁপির পরণের ময়লা কাপড়ছাড়া তাদের নিরাভরণ সুপুষ্ট দেহের আর কোথাও নন্দর দুরবস্থার লেশ-মাত্র চিহ্ন নাই।

নন্দ তামাক সাজিতে সাজিতে কহিল, "সেনেরা এবার বহুকাল পরে বাড়ী এল।"

"শুনেছি।"

"আর ভাই কালে-কালে কতোই দেখব। মেয়েরা সব মেম সাহেবেরও বাড়া—জুতো পায় দিয়ে রান্নাঘরে যায়। জাত মানে না, কাঠ মানে না, শ্বশুরকে দেখেও ঘোমটা নেই। কী বলব বাদল, কিশোর সেনের বৌ সবার সামনেই তার ডাক্তারের সঙ্গে কথা কয়।"

সুনীল হাসিয়া কহিল, "নন্দদা, আজ কাল তো তোমার বড় বিপদ।"

"কিসের?"

"খালি তামাক খেয়ে থাকতে পারো?"

"না থেকে উপায় কী বলো!—তোমাদের এ সব হতচ্ছাড়া স্বদেশী-ওয়ালাদের জ্বালায় আর কি ও-অভ্যাস রাখা যায়।"

সুনীল হাসিয়া উঠিল। নন্দ এ-গ্রামের বিশিষ্ট গঞ্জিকাসেবীদের অন্যতম। পাড়ায় পাড়ায় ত্রি-নাথের মেলা বসে—গঞ্জিকাসেবীদের নৈশ মজলিশ। নন্দর একটানে কলিকার অর্দ্ধেক সাবাড় করার কথা গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলেই জানে। ইদানীং উমেদপুরে কংগ্রেসের পাণ্ডারা গাঁজার দোকানে পিকেটিং সুরু করায় ত্রি-নাথের মেলার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। লুকাইয়া চুরাইয়া দু'চারিদিন গাঁজা কিনিয়া অবশেষে একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে এক হাট লোকের মধ্যে অপমানিত হইয়া নন্দ গোসা করিয়া বদ অভ্যাসটা ছাড়িয়া দিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ এখনো মন্দীভূত হয় নাই। নন্দ মঝেমাঝে ফিকির ফন্দী করিয়া দু'এক ছিলিম যোগাড় করিয়া গোপনেই বাড়ী বসিয়া খায়—গাঁজাতো ভাইদের ডাকিয়া লইয়া সভা গুলজার করিবার দিন এখনো আসে নাই। আশা আছে তার, দু'চার মাসের মধ্যেই পুলিশের লাঠির গুঁতায় স্বদেশীওয়ালাদের জারিজুরি সব বাহির হইয়া পড়িবে। ততদিন তামাকের ছিলিম দ্বিগুণ করিয়াই নন্দের দিন চলিতেছে।

নন্দর স্ত্রী নাড়ু দিয়া জল আনিতে গেল। সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমার দত্তবাড়ী নেমন্তন্ন নেই?"

নন্দ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, "আমি আর কোনো কালে যদি ওদের কোনো কাজকম্মে গেছি তো আমার নাম তোমরা বদলে রেখো। খেতে যেতে হয় যাব। ওদের কাজের ভার আর নিচ্ছি নে।—বড়লোক বলে যা মুখে আসে তা-ই বলবে? কেন? ভারী তো বড়লোক! কুণ্ডুদের কাছে বাড়ীশুদ্ধ মরগেজ।"

"ব্যাপার কী নন্দদা ?"

ব্যাপার যে কি সে-কথার জবাব দিল নন্দর স্ত্রী। জলের গ্লাসটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া মোক্ষদা টগবগ করিয়া উঠিল, "ঠাকুর পো, আমরা গরীব হ'তে পারি, তাই বলে চুরির অপবাদ সহ্য করা যায় না।"

"কী হয়েছে বৌদি ?"

"—দত্ত বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে পুরোতঠাকুরের পূজোর পাওনা ছাতাটা চুরি গেছে। কে নিয়েছে, কে নিয়েছে, খোঁজ খোঁজ ; শেষকালে কানাঘুষা—আর কে ! নিয়েছে তোমার দাদা। তারপর রাত্তিরে বৈকালি হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বড় কাঁসার বাটিশুদ্ধ ক্ষীর নেই। তক্ষুণি নাম পড়ল তোমাদের দাদার।—অথচ এ ক'দিন নাওয়া নেই খাওয়া নেই—রাতদিন দত্তবাড়ী খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মরল যে-লোকটা, মেজো কত্তা তাকে এক-ঘর লোকের মধ্যে ফস্ করে বললেন কিনা—এ তোমারি কাজ।"

সুনীল আর একটা নাড়ু মুখে পূরিয়া মনে মনে হাসিল এক চোট— গত রাত্রের মা ভগবতীর বৈকালীর ক্ষীর এখন তারই পেটে। সুযোগ মত ফস্ করিয়া হাতের খেলা দেখাইতে নন্দ চিরকালই ওস্তাদ। এই বিষয়ে সারা গ্রামে তার বিশেষ খ্যাতি আছে।

এ-বাড়ীর পূজায় বা ও-বাড়ীর বিবাহে কি সে-পাড়ার শ্রাদ্ধে কর্ম্মচারী সাজিয়া নন্দদাসকে সারাক্ষণ সদর ও অন্দরে আনাগোনা করিতে দেখা যায়। দুদিন বাদেই শোনা যায়, এ-টা নাই সেটা নাই, আরো দু'একটি। সব যে নন্দই নিত এমন কোন প্রমাণ নাই। গরীব বলিয়া তুচ্ছ জিনিষের জন্য তার বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া মালশুদ্ধ ধরিবার চেষ্টাও

কেহ কোনদিন করে নাই। তবু সবাই নন্দকে না ডাকিয়া পারে না। এক ছিলিম টানিয়া লইলে এক দমে সে তিন জন লোকের কাজ একাই করিয়া দিতে পারে! এ হেন নন্দ আজ দত্তবাড়ীর ওপর গোসা করিয়াছে। সুতরাং ব্যাপার বেশ একটু গুরুতর সন্দেহ নাই।

সুনীলকে নীরব দেখিয়া নন্দ নিজেই আবার সুরু করিল, "ভা-রী তো বড়মানুষ! দেনার দায়ে মাথার চুল বিকোয়।—কথা বলতে তো আর ট্যাক্স দিতে হয় না—বললেই হ'ল।"

"কী হয়েছে খুলেই বলো না।"

নন্দ টিকার আগুনে ফু দিতে দিতে কহিল, "নরেশ সরকারের কথায় বিশ্বাস ক'রে মেজবাবু আমায় বলেন কি না—এ কাজ তোরই নন্দ, চিরদিনের অভ্যেস তোর। আমি যেন তিন শ' পয়ষট্টি দিন ওর খেয়েই বেঁচে আছি!"

সুনীল থালাটা শুদ্ধ বাকী নাড়ু কয়টা নন্দর ছোট ছেলের সামনে ধরিল। ছেলেটা প্রথম হইতেই খাবারের থালা হইতে চোখ আর ফিরায় না। মোক্ষদা বাধা দিয়া কহিল, "ওকি ঠাকুরপো, ও-ক'টা—তাও রেখে দিলে?" কিন্তু তার কথা শেষ হইতে না হইতে দুই ভাই এক থাবায় নাড়ু কয়টি ভাগাভাগি করিয়া লইয়া লাফাইয়া উঠানে পড়িল। তারপর কার ভাগে বেশী পড়িয়াছে দেখিবার জন্য হাতাহাতি সুরু করিয়া দিয়াছে।

সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "নরেশকাকা এর মধ্যে গেলেন কেন?"

"যাবেন না!" নন্দ আবার উষ্ণ হইয়া উঠিল "সে ও তো এক

বোঁচকা-মারা শুকদেব কিনা! আপিসের টাকা মেরে চাকুরি গেছে এ-কথা ত্রিভুবনের লোক জানে।”

“দ্যাখো নন্দদা। লোকে খামকা অনেক কথা বলে। তোমার নামে মিথ্যে কথাও কি লোকে এমনি বিশ্বাস করবে?”

“লোকের পিছু সে-ও কেন খামকা লাগে? কেবল বড় বড় কথা। পেটে নেই ভাত, তবু চাল দ্যাখ না। ইস্ত্রী মাষ্টারি না করলে কী খায় তা দেখা যেত, এদিকে মেয়েকে পূজোয় দামী শাড়ি কিনে দিয়েছে, লোকের কাছে বড়মানুষী দেখাবার জন্যে।”

নন্দর স্ত্রী শঙ্কিত হয়। মহা বিপদ! তার ক্ষীরের নাড়ুর টোপ বুঝি ফসকাইয়া যায়। অনুদের বাড়ী সুনীলের গতায়াত ও দু’চারজনের কানে কানে সুনীলের সঙ্গে অনুর গলাগলি হাসিঠাট্টার মুখরোচক গল্প যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে মোক্ষদা তাদের দিয়াছে এমন একটা সন্দেহও সে করিয়াছিল, আজ অঞ্জলি দিবার সময় একজন। কাপড় যে সুনীলই চণ্ডীমণ্ডপে অণিমাকে দেখিয়া।

“পরের দেখে তোমার অত চোখ টাটায় কেন বলো দিকিনি। থামো না।”—মোক্ষদা স্বামীকে বাধা দেয়।

“থামব কেন?—ভয় করি কাকে?” নন্দ তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, “মেয়েটার দেমাক দেখে গাঁ-শুদ্ধ লোক নিন্দে করে।”

“বাপকে ছেড়ে মেয়েকে ধরছ কেন নন্দদা?—বাপ তোমার চোর বলেছে যত পার তাকেই বলো।”

নন্দর স্ত্রী স্বামীকে চক্ষুর ইসারায় নিষেধ জানায় বার বার। বৃথা চেষ্টা। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই নন্দর। ইঙ্গিতটা লক্ষ্য করিল সুনীল।

নন্দ বলিয়া চলিল "এই তো আষাঢ় মাসে নয়গাঁ থেকে মেয়ে দেখতে এল, দোজবর ব'লে মেয়ে কিছুতেই ঘর থেকে বারান্দায় এল না—চৌকির পায়া ধরে শক্ত করে লেগে রইল—পাড়ার হেন লোক ছিল না যে একবার মেয়েকে সাধ্যসাধনা করেনি। শেষকালে ভদ্দর লোকেরা রেগে চলে গেলেন। গ্রাম শুদ্ধু ঢিঢি। গুণধর বাপ আবার সবার কাছে বড় গলায় গেয়ে বেড়ায়—বেশ করেছে! আমার মেয়েকে বুঝি যার তার সঙ্গে বিয়ে দেব।—কথায় বলে, পেটে নেই ভাত······"

"আঃ থামো না। পরের কথায় তোমার অত কাজ কী!"

স্ত্রীর নিষেধে নন্দ কিন্তু আরো রুখিয়া ওঠে "যা যা, বক্ বক্ করিস্ নে। নিজের কাজে যা। আমি যেন তোরই বুদ্ধি নিয়ে কথা বলতে যাব।"

মানদা নিরুপায় হইয়া সুনীলের পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়। অঙ্গভঙ্গী করিয়া স্বামীকে বহুকষ্টে জানাইয়া দেয়—ব্যাপারটা ভালো হইতেছে না। কেন ভাল হইতেছে না তাহা বুঝিতে না পারিলেও প্রসঙ্গটা এখন ধামা-চাপা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া নন্দ দাস এবার হাসিয়া উঠিল, "ভাবছ কী বাদল ভাই?—রাগলে আমার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। কী বলতে যে কী সব বলে ফেলি!"

সুনীলের পিঠের দিকে একজোড়া চোক না থাকিলেও ব্যাপারটা চাপা থাকে না। বুঝিল, তাকে আর অনুকে লইয়া এ-পাড়ার আর কোথাও না হউক, অন্ততঃ নন্দর স্ত্রীর মনে একটা কুশ্রী সন্দেহ দেখা

দিয়াছে। সর্ব্বনাশ! বাত্তাসটা ছড়াইয়া পড়িতে বেশী দেরী হইবে না। সুনীল মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিত হইয়া ওঠে।

পরক্ষণেই মুখে হাসির রেখা টানিয়া নন্দকে কহিল, "চলো নন্দদা, একটু বাইরে চল।"

বাড়ী আসিয়া সুটকেস খুলিয়া তিনটি টাকা দিতেই নন্দ একগাল হাসিয়া জানাইল, "দ্যাখো ভাই, রাগলে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। আর কাণ্ডজ্ঞান আমার হবেই বা কোত্থেকে বলো। তো ভাই?"

বিদ্যে তো কানাই সরকেলের পাঠশালাতেই খতম—তুমি রাগ করো নি

"যেখানে চলেছ যাও না।—রাগ করব কেন?"

নন্দ কথা শুনিয়া নিশ্চিত্ত হইতে পারিল না। কহিল, "দ্যাখো ভাই, লোকে যে যা-ই বলুক, অনু সত্যি বড় ভালো মেয়ে। ওর মাকে—"

সুনীল একটু রুক্ষভাবেই কহিল, "যাও না নন্দদা। অনুদের কথা তোমায় কেউ জিগগেস করে নি তো।"

নন্দ ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া চলিল। তার মনে মনে আশা, বাড়ী হইতে যাইবার আগে সুনীলের কাছ হইতে আর এক খেপে অন্ততঃ গোটা দুই টাকা খসাইতে হইবে। সেই সম্ভাবনা বুঝি নষ্ট হয়। নন্দ পিছনে ফিরিয়া ডাকিল, "বাদল, আমি বাজারে যাচ্ছি।—কাপড় আনতে চলেছি। কী রকম পাড় আনব বলো তো।"

নন্দ যতটুকু পথ আগাইয়াছিল আবার ততটুকু ফিরিয়া আসিয়াছে। সুনীল জবাব দিল, "তোমার যা ইচ্ছে—আমি তার কী জানি!"

"বা রে। ভাইঝিদের কাপড় দিচ্ছ তুমি, পাড় পছন্দ করব কি

আমি নাকি? তোমরা সহরে থাক, তোমাদের আর আমদের কি এক চোক!"

মজা মন্দ নয়! সুনীল এবার বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, "তুমি বড় বক্‌বক্ করতে পারো নন্দদা।"

বুদ্ধিমান নন্দদাশ আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়ে।

নন্দকে টাকা দিল কি তাহার মুখবন্ধ করিবার জন্য? ঘুষ? কেন? কার ভয়ে? কিসের ভয়? সুনীল এমন কোন অপরাধ করে নাই যার জন্য নন্দ দাসের মত লোকের কাছেও নিজেকে এতটা দায়ী মনে করিতে হইবে!

তবু সুনীল পিছনে ডাকিল, "নন্দদা, শুনে যাও।"

নন্দ আবার ফিরিয়া আসিল।

"নন্দ দা, তোমায় খামকা কতকগুলো শক্ত কথা বলেছি, কিছু মনে করো নি তো?"

"সে কি! আমায় আবার শক্ত কথা বললে কখন? তোমার মত ইয়ে—"

"ত্যাখো নন্দদা; তোমার মতো আমারো সব সময় মাথা ঠিক থাকে না। কী বলতে কী সব বলে ফেলি। মনে করো না কিছু।"

"দুর!" নন্দ দাস হাসিয়া ওঠে। বাদলকে সহসা এমন নরম হইতে দেখিয়া একটুখানি বিস্মিতও হয়।

"নন্দ-দা, যাবার আগে আরো গোটা কয়েক টাকা দিয়ে যাব'খন। তোমার বড্ড কষ্ট আজকাল।"

নন্দ একগাল হাসিয়া হৃষ্ট মনে চলিয়া যায়। সুনীলও হালকা হয় অনেকখানি। নন্দ দাসকে হাতে রাখিতে হইবে। তাকে এখন রাগাইলেই বিপদ। কিছু নয় তবু তিলকে তাল করিয়া সারা গ্রামে ছড়াইয়া বেড়াইবে।—কি ?

নয়

অণিমাদের উঠানটুকু পার হইয়াই সুনীলের এতক্ষণে মনে পড়ে মার কথা। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চয় তিনি ভাবিতেছেন, ছেলে তাঁহার গেল কোথায়? ভাবুন না! সে-ও তো ভাবিতে পারে, মা গেলেন কোথায়?—কার বাড়ী?

এই ঘণ্টা তিনেক সত্যই কি সুনীল মার কথা ভাবিয়াছে? ভাবিবে সে সময় কখন? অণিমা যে এত কথাও বলিতে জানে কে জানিত আগে। সুনীল মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, আজ গিয়াই অভিযোগ সুরু করিবে —কাল রাত্রে অত অভিমান কিসের জন্য? কিন্তু তাহাকে আজ কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়া অণিমা আগেভাগেই শত কণ্ঠে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সাজিয়া গুজিয়া, সুনীলের দেওয়া কাগজের সেই রঙীন শাড়ীখানি পরিয়া, বাহির হইতেছিল নাকি বাদলদাদের বাড়ীর উদ্দেশেই। বাদলদা আজ সারা দিনে একবার খোঁজও লইল না—অসুখ-বিসুখ করে নাই তো—সে কথাটাই নাকি জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতে উন্মন হইয়া উঠিয়াছিল।

কল্যকার অভিমানিনী আজ একেবারে কলভাষিণী। এই তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে বাদলদাকে দুই বার চা করিয়া দিয়াছে, সর ভাজিয়া খাওয়াইয়াছে, নিজের খাতায় একটা কবিতা লেখাইয়া আবৃত্তি শুনিয়া লইয়াছে, নিজের হাতে তৈরী একখানি রুমাল উপহার দিয়াছে—এমন করিয়াছে, বলিয়াছে ও শুনিয়াছে অনেক কাজ ও অনেক কথা। মেয়েটা যেন পাগল! কাল অভিমানে অটল অনড়। আর আজই সবকথা ভুলিয়া গিয়া পাহাড়ে-নদীর মত গতিময় আর গীতিময়!

অণিমাকে আজ সুনীলের মত ছেলেও মাঝে মাঝে একটু লজ্জাহীন না ভাবিয়া পারে নাই। সুনীল যেন এক রেলওয়ে ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া আছে, গাড়ী ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই—অণিমা যেন এক নিঃশ্বাসে সব কথা সারিয়া লইতে চায়, কি জানি কখন বাঁশী বাজিয়া ওঠে।

অথবা, হয়তো বা, মেয়েটা মনে করে—সুনীল তার আকর্ষণের নাগালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইলে এই সময়। যত শক্তি যত কৌশল জানা আছে অণিমা তার সব গুলিই প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে এক সঙ্গে। সুনীল বুঝিয়াছে সবই আর হাসিয়াছে মনে মনে। তবু ভাল লাগে আগাগোড়া। নমিতার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি নাই এই যা তফাৎ। অভিনয়টুকু নিখুঁত নয় এই যা অপরাধ। অভিনয়? দোষের কি? জীবনের অর্দ্ধেকই তো অভিনয়!—অণিমার সঙ্গে সুনীলের, সুনীলের সঙ্গে অপরের, সকলের সঙ্গে সকলের। নহিলে যেন এই জীবনই চলেনা। নহিলে এত কাছে আসিয়াও সুনীল মনের কথাটি অণিমাকে আজ খুলিয়া বলিতে পারিল কৈ? নির্জ্জন ঘরেও নিষেধটা শুধু বাইরেরই নয়, মনেরও? মার কাছেই বা অনেক কিছু

লুকাইয়া চলিতে হয় কেন?—মার প্রতি আন্তরিকতা দেখাইতে গিয়া বেশ একটু আতিশয্যের আশ্রয় লইতে হয় কি কারণে?

যাক সে কথা। ন'কাকীমার অদ্ভুত আচরণে সুনীল আজ খুশী হইয়াও বিস্মিত হইয়াছে কম নয়। কতবার কাজের অছিলায় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, আবার খানিক বাদেই ফিরিয়া আসিয়া দু'জনের কথার মধ্যে অর্থহীন ফোড়ন দিয়াছেন। একবার নয়, দুইবার নয়, বহুবার এমনধারা ঘর বার করিয়াছেন অকারণেই। যতটুকু নিশ্চিন্তে আর নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে দিতে পারা যায়, সুলতা সেইটুকু সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিতে কসুর করেন নাই। কিন্তু ইহার বেশী আর নয়। তাই সুনীল আর অণিমার তন্ময় সংলাপের মাঝখানে বেরসিকের মত আসিয়া ঘন ঘন সুর কাটিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন উভয় পক্ষকে।

কেন? বিবাহের মন্ত্রটা এখনো পড়া হয় নাই বলিয়া? তাই ভবিষ্যৎ ভাবিতে হয়, শঙ্কা-সম্ভাবনার কথা তুলিতে হয়, ভালমন্দের বিচার বিবেচনা করিতে হয়? নহিলে আপত্তি নাই কোনখানে? অথচ সুলতা সম্ভব হইলে এই মুহূর্তে মেয়েকে সুনীলের হাতে গছাইয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

মন্দাকিনীও তো নিঃসঙ্গ ছেলের একটি সঙ্গিনী জুটাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন—ছেলের মুখের কথা পাইলে আজই যে-কোন কন্যা-পক্ষকে পাকা কথা দিয়া ফেলিবেন। কিন্তু সুনীল যদি বলিয়া বসে, অণিমাকেই সে ঘরে আনিবে; এবং ব্যাপারটাও অনেক সহজ; অনেক হাঙ্গামা—চিঠি লেখালেখি, হাঁটাহাঁটি, দর কষাকষি, বাঁচিয়া যায়; কাজটা শুধু এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ীতে একটি যুবতী মেয়েকে কোন একটা শুভ

দিনে লইয়া যাওয়ার মামলাটুকু। তবে? মার মেঘলা মুখখানি সুনীলের মনের চোখে ভাসিয়া ওঠে। মনে মনে হাসে, কৌতুক বোধ করে, একটু অদ্ভুত আনন্দও যেন পায়। মাকে একটা আঘাত দিতে পারিলে যেন সে খুশী হয় এখন। এত অকারণ বাড়াবাড়ির একটা পাল্টা জবাব হয় চমৎকার।—শেষকালে অণিমা কিনা মন্দাকিনীরই পুত্রবধূ!

থাক সে কথাও। আসল কথা, আজকের দিনের সব চেয়ে বড় কথা, অণিমাকে আজ সে টুক্ করিয়া একটা চুমু খাইয়া ফেলিয়াছে। অতর্কিত অনিবার্য্য চুম্বন! মুহূর্ত্তের মধ্যে অণিমা মাথা নোয়াইয়া এলোচুল ছড়াইয়া ভাঙিয়া এলাইয়া পড়িল বিছানার উপর—যেন একটা মোমের পুতুলে আগুন ধরিয়াছে! সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড, মিনিটের পর মিনিট—বহুক্ষণ। তার পর অণিমা চট করিয়া উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল সর্ব্বাঙ্গে লজ্জার বোঝা টানিয়া। সুনীলের কিন্তু এখন হাসি পায়। তার একটা কথারও জবাব দিল না অমন মুখরা অণিমারাণী! কি সুন্দর হাস্যকর অসহ্য অদ্ভুত লজ্জা!

অণিমাদের উঠানটুকু পার হইয়া সুনীলের হালকা মনে এখন নৃত্য শুরু করে সেই রঙীন মুহূর্ত্তগুলি।—অণিমার সেই নুইয়া-পড়ার ছন্দটুকু, চুল ছড়াইয়া দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিবার ছাদটি, তির্য্যক ভঙ্গীতে ঘর ছাড়িয়া পালাইবার ছবিখানি।

তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়াছে সুনীল; হয়তো মা সবেমাত্র ফিরিয়াছেন। আসিয়াই বুঝি বড় ছেলের খোঁজ লইতেছেন—নীলুর কাছে, বাবলুর কাছে। সারাদিন ছেলের সঙ্গে কথা বলেন নাই বলিয়া বোধ হয় অনুতপ্ত হইয়া উদগ্রীব হইয়া আছেন সুনীলের আগমন প্রতীক্ষায়। অসম্ভব কি!

মায়ের মন! সুনীল তো কথা কহিবে না এমন কথা বলে নাই; ডাকিলেই সাড়া দিবে। লজ্জা কি, দ্বিধাই বা কেন, ভয় কিসের?

অণিমাদের বাড়ীর সীমানা পার হইতেই সুনীলের সামনে পড়ে ছোট বোন নীলু।

"এই সন্ধ্যে বেলা যাচ্ছিস কোথায়?"

"না"—নীলু থমকিয়া দাঁড়ায়।

"না কি—কোথায় যাচ্ছিস?"

"অনুদিদের বাড়ী?"

"কেন?"

নীলু উত্তর দেয়না। কি একটা কথা সে লুকাইতে চায়। সুনীল তার হাত ধরিয়া কহিল, "বল"

নীলু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সন্দিগ্ধ সুনীল এবার ধমক দিল—"বলনা কোথায় যাচ্ছিস?"

নীলু ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "মা বলতে বারণ করে দিয়েছে।"

সুনীল হাসিয়া কহিল, "তোর ভয় নেই—মাকে বলবনা। বল।"

"তুমি অনুদিদের বাড়ী রয়েছ কিনা তা দেখে আসতে পাঠিয়েছে।"

"বেশ তো। সে-কথা লুকোচ্ছিস কেন বোকা মেয়ে?" সুনীল প্রসঙ্গটা হাসিয়া হাল্কা করিয়া দিতে চাহিল। নীলু নিজের অহাম্মকি স্বীকার করিতে নারাজ। কহিল "মা যে বলে দিল, তোর দাদা যেন দেখেনা তোকে। দেখে ফেললে বলবি, এমনি এসেছি।"

দপ করিয়া সুনীলের মাথায় যেন সারা শরীরের রক্ত আসিয়া জমা হয়! নীলুকে পাঠাইয়াছেন মা দৌত্যগিরির কাজে। ছি-ছি!

ভিতরের রাগ চাপিয়া সুনীল বোনকে কহিল, "তুই বাড়ী যা। আমি একটু বাদে যাব।"

বাড়ীর সীমানায় আসিয়া সুনীল পদ্মার দিকে চাহিয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ পদ্মার মতই তার মনেও এখন এক অন্ধ দুরন্ত বেগ!

নদীর ওপারে সূর্য্য পাটে নামিয়াছে। সন্ধ্যা লাগে লাগে। রাত্রির ঘন আস্তরণের প্রথম পরদাখানি চতুর্দ্দিকে নামিয়া আসিতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ফিরিতেছে আপন আপন বাসায়। দূরে ও নিকটে নদীর বুকে ছোট-বড় ডিঙিগুলিতে কেরোসিনের ডিবিয়া মিটমিট করে।

দাওয়ায় বসিয়া আছেন ঠাকুরদা। সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়া মন্দাকিনীও শ্বশুরের পিছনেই চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। পাশেই নীলু। ঠাকুরদার কোলে বাবলু। সারা সংসার সুনীলেরই অপেক্ষায়।

ব্রজনাথ কহিলেন, "কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?"

সুনীল জবাব না দিয়া ঠাকুরদাদার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল মাটিতেই। ভাবিয়া আসিয়াছিল, মাকে আচ্ছা করিয়া আজ দু'কথা শুনাইয়া দিবে। সব কিছুরই সীমা আছে! নয় বছরের মেয়েটাকে এ-সব সন্দেহ-অবিশ্বাসের মধ্যে টানিয়া না আনিলে কি ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইত! আজ একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ছাড়িবে সুনীল। কিন্তু ঠাকুরদা মাঝে পড়িয়া সকল দিক বাঁচাইয়া দিলেন। বরং মন্দাকিনীই একবার পুত্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। জিত হইল যেন তাঁরই!

বাবলু কি ভাবিয়া ঠাকুরদার কোল ছাড়িয়া আসিয়া দাদার কোল

জুড়িয়া বসিল। ব্রজনাথ বলিতে লাগিলেন, "বৌমা তো ভেবে ভেবে অস্থির। সারা বিকেলটা কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

সুনীল রাগ দেখাইয়াই কহিল, "তোমাদের হয়েছে কী বলো তো? আমি কি কচি খোকা, দু'দণ্ড চোখের আড়াল হলেই অস্থির কাণ্ড।"

ব্রজনাথ সামনের একটা পিঁড়ি দেখাইয়া কহিলেন, "উঠে বস—মাটিতে বসিস নে। তোর সঙ্গে যে আমার অনেক কথা আছে। ছুটী তো ফুরিয়ে এল।" তারপর একটু কাশিয়া লইয়া কহিলেন, "কাল-পরশু সেই মেয়েটীকে একবার দেখে আয়। আজ তারা লোক পাঠিয়েছিল।"

সুনীল চুপ করিয়া আছে।

ব্রজনাথ হাসিয়া কহিলেন, "জবাব দিচ্ছিস না যে? এতক্ষণ তো বেশ কথা বলছিলি। বৌমা কোথায় গেলে গো? এবার বলো সেই কথা।"

মন্দাকিনী সাড়া দিলেন না। রান্নাঘরের দুয়ার থেকে নীলু ডাকিয়া কহিল, "দাদা, তুমি এ-বেলা কী খাবে?"

ব্রজনাথ প্রসঙ্গটা তুলিতে যাইবেন, নীলু আবার সুধাইল, "তোমায় এখন চা করে দেবে?"

"না"

মন্দাকিনী প্রদীপ লইয়া তুলসীতলায় চলিয়াছেন। ব্রজনাথ ডকিলেন, "কি গো বৌমা, বাদল তবে মঙ্গলবার দিন মেয়ে দেখতে যাবে—কাল তাদের সে কথাই বলে পাঠাই?"

"আমি তার কী জানি!"

"তুমি জান না মানে ?"

"আজকাল তো আর বাপমার-ইচ্ছেয় বিয়ে হয় না" বলিয়া মন্দাকিনী হাতের আড়ালে প্রকম্পিত প্রদীপের শিখা বাঁচাইয়া তুলসী তলার দিকে চলিলেন।

নীলু শাঁক ফুঁকিল। বাবলু দাদার কোল ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গেল ঘণ্টা বাজাইতে। দত্ত বাড়ীও সন্ধ্যারতির ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মন্দাকিনী তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিলেন নিরুদ্ধ নিশ্বাসে। মিনিট দুই স্থির হইয়া দেবতার উদ্দেশে আজ পুত্রের মঙ্গল কামনা করিলেন কম্পিত শঙ্কিত মনে।

মন্দাকিনী তুলসীতলা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দাওয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকারে একবার অপরাধী পুত্রের মুখের দিকে তাকাইলেন। তারপর উঠিয়া গেলেন ঘরের মধ্যে। সুনীল ঠায় বসিয়া আছে তেমনি নিশ্চল, গম্ভীর। এবারও মায়েরই জিত! অসহ্য!

ব্রজনাথ ডাকিলেন, "উঠে আয় বাদল। বাইরে বসে কেন ?—তুই তো বৌ আনতে আর এক্ষুণি যাচ্ছিস না রে দাদু। অত ভাবনা কিসের ?"

"উঠে এস দাদা, বাইরে থেকো না," ঠাকুরদার অনুকরণে পাকামি করিয়া বাবলু বারান্দায় দাদার কাছে ছুটিয়া আসিল। সুনীল ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে আসে।

দাদার কোলে বাবলুকে দেখিয়া নীলু গিয়া ঠাকুরদাদার কোল জুড়িয়া বসিল। মন্দাকিনী প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া বিছানার একপাশে চুপ

করিয়া বসিয়া আছেন। দাদার কোলে বসিয়া ছোট ভাই আবার পূর্ব্বপ্রসঙ্গ তুলিল। প্রশ্ন করে, "দাদা তুমি কবে বিয়ে করবে?"

"হুঁ"

"কবে?"

"আজ"

"কাকে?"

"ঐ আলমারীটাকে।"

"দুর বোকা! আলমালীকে বুঝি কেউ বিয়ে করে।—তুমি অনুদিকে বিয়ে করতে চাও, না?"

সুনীল তার মুখের দিকে তাকায়। এ-কথা শিশু পাইল কোথায়? দাদাকে নীরব দেখিয়া ভাইয়ের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। কহিল, "হাঁ, তুমি অনুদিকে বিয়ে করবে!—মানা-বৌ মাকে বলছিল।"

মানদাকে নীলু ও বাবলু মানা-বৌ বলিয়া ডাকে! মা ও মানদার গোপন আলোচনার মাঝখানে ছয় বৎসরের শিশু উপস্থিত ছিল। সকল কথার মধ্যে এই সামান্য কথাটি সে বুঝিয়া মনে রাখিয়াছে!

"বলো দাদা, তুমি অনুদিকে বিয়ে—"

ঠাকুরদার কোলে নীলু ভাইয়ের কথা বন্ধ করিবার জন্য তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "এই—ই—ই।" নয় বছরের মেয়ে সে। অনেক কিছুই ভাল না বুঝিলেও একটু আধটু ধরিবার ছুঁইবার বয়স হইয়াছে তার! মা ও মানদার আলোচনায় সে-ও একজন শ্রোতা ছিল! কিন্তু তার আজ এই বুদ্ধিটুকু জন্মিয়াছে যে, দাদার অপরাধের গুপ্ত আলোচনার

কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করা চলে না। সুনীলের উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে সারা ঘরটা যেন একবার প্রচণ্ড ঘুরপাক খাইয়া লয়।

ঠাকুরদাদা হাসিয়া কহিলেন, "দূর বোকা! তোর দাদা অন্য বাড়ীর মেয়ে বিয়ে করতে যাবে কোন দুঃখে বল। তার কনে তো এই আমারি কোলে।" ঠাকুরদাদার কোলে নয় বছরের আদুরে নাতনী তাকে চিমটি কাটিয়া আনুনাসিক প্রতিবাদ জানাইল—উঁ-হুঁ।

"বেশ তো, দাদাকে যদি পছন্দ না হয়, আমি তো রয়েছি।"

ব্রজনাথের রসিকতা আজ আর কেহ উপভোগ করিল না। মন্দাকিনী নির্ব্বাক। নির্ব্বাক সুনীল! শুধু বাবলু দাদার গলা জড়াইয়া আর একবার রাঙা টুকটুকে বৌ আনিবার বায়না ধরিল।

মন্দাকিনী মনে মনে শঙ্কিত হইয়া ওঠেন। আগেভাগে রাগ দেখাইয়া কাজটা ভাল করেন নাই। ছেলের সঙ্গে এখন মিষ্টি ব্যবহার করিয়া চলিতে হইবে। নহিলে এই তিন-চার মাইল হাঁটিয়া এত সব ব্যবস্থার সবই হইবে পণ্ডশ্রম। চক্কোত্তি মশায় বার বার বলিয়া দিয়াছেন, আজই ছেলের বিছানার তলায় সিঁদুরমাখানো মন্ত্রপূত বেলপাতাটা যেন উপুড় করিয়া রাখা হয়—এক রাত্রি ঘুমাইয়া উঠিলেই, ব্যস!

বাড়ী ফিরিয়াই সেই কাজটা মন্দাকিনী সর্ব্বপ্রথম সারিয়া রাখিয়াছেন। সুনীলের বিছানায় তোষকের তলায়—মাথার কাছে, বালিসের ঠিক নীচে—বেচারা নির্জ্জীব বেলপাতা এখন যথারীতি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এ তো গেল অণিমার মার প্রভাব কাটানো। কিন্তু আসল কাজটা যে এখনো বাকী। অণিমার উপর আকর্ষণ নষ্ট করিবার মাদুলিটা মঙ্গলবারে পরাইবার দিন। সামনের মঙ্গলবার ছেলে তো এতক্ষণে

কলিকাতায়। সুতরাং আজ, এই মঙ্গলবার, সারা দুনিয়ায় মহাপ্রলয় ঘটিলেও যেমন করিয়াই হউক 'খোকার' হাতে মাদুলিটা বাঁধিয়া দিতেই হইবে।

সারা রাস্তায় মন্দাকিনী ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, বাড়ী ফিরিয়াই ছেলের সঙ্গে হাসিয়া কথা কহিবেন—যেন কিছুই হয় নাই, কিছুই জানেন না, এতটুকু সন্দেহ করেন নাই! তাহা হইলে আজকালকার অবিশ্বাসী ছেলেকে অনুনয় করিয়া হাতে ধরিয়া মাথার দিব্বি দিয়া মাদুলি একটা পরাইয়া দিতে পারিবেন অনায়াসেই। কিন্তু বাড়ী আসিয়া যে-ই শুনিলেন 'খোকা' বাড়ী নাই, বহুক্ষণ সে (হয় তো সারাদিনই) অণিমাদের বড়ীতেই কাটাইয়াছে, সেই যে তার মেজাজ বিগড়াইয়াছে আর হুঁস হইল এতক্ষণে। শেষকালে রাগিয়া মাগিয়া ব্যাপারটা মাটি করিবেন না কি? রাগ করিবার দিন পড়িয়া আছে অনেক!

কিন্তু কি দিয়া কথা আরম্ভ করিবেন মন্দাকিনী ভাবিয়া পান না। সুনীল চুপচাপ বসিয়া আছে তো বসিয়াই আছে। আর তার ঠাকুরদা বিবাহের কথা, সংসারের কথা—কত কাজ-অকাজের কথা বলিয়াই চলিয়াছেন। অন্যমনস্ক নাতী যে সে-সব শুনিতেছে না সে-কথাটা শুধু মন্দাকিনীই টের পান।

খানিক বাদে ব্রজনাথ বার-বাড়ী চলিয়া যাইতেই সুযোগ বুঝিয়া মন্দাকিনী এবার ছেলের বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়ান।

"খোকা!"

ছেলে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে।

"খোকা, আমার একটা কথা রাখবি?"

নীলু আর বাবলু আসিয়া সামনে দাঁড়ায়।

"খোকা"

"কী ?"

"আমি কাল রাত্তিরে একটা খারাপ স্বপন দেখেছি—তোকে নিয়ে," মন্দাকিনী অকারণেই একবার ঢোক গিলিয়া লইলেন, "সারা বছর থাকিস দূরে, সেই বিভূঁই বিদেশে, আমার বুক কাঁপে রাতদিন। বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি রে। মা দুগ্গার কৃপায়—"

মন্দাকিনী ছেলের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু থামেন। কিন্তু হাল ছাড়িলে চলিবে না। এতটা অগ্রসর হইয়া এইটুকু শক্ত কাজের জন্য পিছপাও দিবার পাত্রী তিনি নন। ছেলের কাছে মার আবার অত ভয় কিসের! সস্নেহে ছেলের একখানি হাত ধরিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মীটি, অমান্যি করিস নি। তোরা আজকালকার ছেলে, ও-সব না মানতে পারিস, আমি তো বিশ্বাস করি। আমার নিশ্চিন্তি করবার জন্যে দুদিন এটা পর। পরে না হয় কলকাতা গিয়ে ফেলে দিস, আমি আর দেখতে যাব না। আজ আমার অনুরোধটা ফেলিস নে—আমার মাথার দিব্বি—"

কি পরিতে হইবে ? সারাদিন মুখ বন্ধ করিয়া হঠাৎ এই কাকুতি-মিনতি কিসের জন্য ? মার বিরক্তিকর ভূমিকায় উত্যক্ত হইয়া ছেলে তাঁর মুখের দিকে তাকায় জিজ্ঞাসু চোখে। তাহার রুক্ষ দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়াই বড় আশায় মন্দাকিনী ফস করিয়া কথাটা পাড়িয়া বসিলেন, "এই মাদুলিটা তোকে পরতে হবে। আমি কাল রাত্তিরে—"

"আমি এসব তুকতাক মানি না তা জানো ?"

"আমি তো মানি।"

"তা হলে নিজের হাতে বেঁধে রাখো।"

মন্দাকিনী কণ্ঠস্বরে করুণ আবেদন মাখাইয়া কহিলেন, "আমি তোর মা। দুদিন আমার একটা অনুরোধ রাখলে তোর কোন ক্ষেতি হবে না রে। লক্ষ্মীটি! আমার মাথা খা।—এই মাদুলিটা—"

"কিসের মাদুলি ওটা?"—উত্তেজিত কণ্ঠে সুনীল প্রশ্ন করে।

"তামার"

"সোনার যে নয় তা দেখতেই পাচ্ছি। কিসের জন্যে এ মাদুলি পরাতে এসেছ তাই জিগ্‌গেস করছি।"

মন্দাকিনী জোর করিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিলেন, "ছেলের কথা শোন। এতক্ষণ তোকে বললাম তবে কী! কাল রাত্তিরে তোকে নিয়ে একটা বিশ্রী দুঃস্বপন দেখেছি।"

"কী স্বপ্ন?"

"ও-সব খারাপ স্বপন বলতে নেই।"

সুনীল ফোঁস করিয়া ওঠে, "ও সব বাঁকা কথা ছাড়ো। তোমার মনের কথা আমি টের পাই নি ভেবেছ?"

"কী আমার মনের কথা তুই টের পেলি?" মন্দাকিনীও উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া এবার একটু উত্তেজিতভাবেই চৌকির উপর হইতে উঠিয়া দাঁড়ান। পুত্রের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "তোর ভালমন্দ ভাববার অধিকারটুকুও আমার নেই!—এমনি কপাল নিয়েই তোকে পেটে ধরেছিলাম!"

"আমার ভালমন্দ তোমায় ভাবতে হবে না—" বসিয়া সুনীল

বিছানার উপর হইতে সুতা-বাঁধা মাদুলিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল মেঝের উপর। খটাস্ করিয়া একটা শব্দ হয় লক্ষ্মীর আসনের জলচৌকিটায়।

মন্দাকিনী কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ফাটিয়া পড়িলেন দারুণ আক্রোশে। কণ্ঠস্বর কয়েক পরদা চড়াইয়া দিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভালমন্দ ভাবার লোক আজ পেয়েছিস কিনা— তাই মা বেটি এখন আর কে তোর! সারাদিন তো সেই ভালোদের কাছেই পড়ে থাকিস। তোর তো আর ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই। আছে কতকগুলো দাসীবাঁদী, দয়া করে দুটো খেতে দিস তাই খায়।"

"ও সব প্যাঁচানো কথা ছাড়ো, বলছি। সোজা করে বলো, কী তোমার মতলব"

রাগে দুঃখে মন্দাকিনীর মুখ দিয়া কথাগুলি আর বাহির হইতে চায় না। সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপে।

"আমি বাড়ী থেকে চলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচো। বেশ তো, কালই আমি—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মন্দাকিনী আহত ফণিনীর মত ফুঁসিয়া উঠিলেন, "মা ভাই বোনের জন্যে তো আর বাড়ী আসিস নি। এসেছিস যাদের কাছে, যা না সেখানে। অণিমার আঁচল ধরে বসে থাক্‌গে। আমরা তোর কে?"

মার এই জাতীয় ইঙ্গিতের জন্য সুনীল অপ্রস্তুত ছিল না। তবু মা যে এতখানি মাত্রা ছাড়াইবেন তাহা ভাবে নাই। পাল্টা জবাবে ছেলেও স্থান কাল পাত্রের কথা ভুলিয়া গিয়া বলিয়া বসিল, "তুমি বড় ইতর হয়ে গেছ।—ভদ্রঘরের মেয়ের মতো কথা বলো।"

"কী !!!—আমি ইতর !" মন্দাকিনী একটা বোমার মত ফাটিয়া পড়েন, "আর ভদ্দলোক হচ্ছে অনু আর অনুর মা ?"

"চেঁচিও না ।—এটা ভদ্রলোকের পাড়া ।"

"চেঁচাব না ?—এক শ' বার চেঁচাব। তোকে পেটে ধরলাম আমি, আর আজ তোর আপন হ'ল অনুরা !" মন্দাকিনী এবার গর্জ্জনের সঙ্গে বর্ষণ সুরু করিলেন। তাঁর ক্রন্দন শুনিয়া ওঘর হইতে বৃদ্ধ ব্রজনাথ আসিয়া হাজির।

"এ কি বৌমা !—ব্যাপার কী রে বাদল ?"

নীলু আর বাবলু এককোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে ভয়ে ভয়ে মন্দাকিনী জবাব দিবেন কি—কাঁদিয়া কাটিয়া কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করিয়া চলিয়াছেন।

"কী হয়েছে বাদল ?"—ব্রজনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করেন। তিনি কানে একটু কম শোনেন আজকাল। নহিলে ওঘর হইতেই অনেক কথা শুনিতে পাইতেন।

"কিচ্ছু হয় নি ঠাকুরদা। তুমি ওঘরে যাও।—কথা শোন। তুমি এর মধ্যে এসো না। ওঘরে যাও, আমি তোমায় পরে সব কথা বুঝিয়ে বলব।"

"কী হচ্ছে এ-সব ?"

"বলব'খন। যাও—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, যাও! তুমি এখন যাও ঠাকুরদা"—সুনীল বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাহাকে প্রায় জোর করিয়াই ঘরের বাহিরে লইয়া গেলেন। এদিকে মন্দাকিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া অণিমাদের চৌদ্দ পুরুষের কোষ্ঠী কাটিয়া চলিয়াছেন।

ব্রজনাথ হতভম্বের মত খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া এক পা দু পা করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

সুনীল আবার ঘরে ফিরিয়া আসে! নীলু আর বাবলু দুজনে ইতিমধ্যে মার কোল ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছে। মন্দাকিনীর মরা-কান্না আর থামে না—"সুলতার মনে এত বিষও ছিল গো!—ছেলেকে আমার গুণ করেছে গো!"

"তুমি এ-সব বলছ কী পাগলের মতো!" সুনীলের রাগ পড়িয়া গিয়া এখন ভয় দেখা দিয়াছে। কান্নকাটি শুনিয়া পাড়ার লোকজন আসিয়া পড়িলে কেলেঙ্কারীর বাকীটুকু সুসমাপ্ত হয়। এবার কণ্ঠস্বর যথাশক্তি নরম করিয়া কহিল, "দশ বছরের মেয়েটা সামনে, সে কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়েছ!—এ-সব বলছ কী তুমি! ঢের হয়েছে। এবার থামো।"

"কার ভয়ে থামব?—দু'টি খেতে দিস্, সেই ভয় দেখাস কাকে? আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ধান ভেনে খাব, দশ দুয়ারে মেগে খাব! তা-ও না জোটে, পদ্মা নদী আছে—ছেলেমেয়ে দুটোর হাত ধরে তোকে নিষ্কৃতি দিয়ে যাব। কী এমন ভয় দেখাস তুই?—" মন্দাকিনী ফুঁসিয়া রুষিয়া কাঁদিয়া চলিলেন।

"ওঠ মা"—নীলু ভূলুণ্ঠিত জননীকে মাটি হইতে উঠাইবার চেষ্টা করে।

"মা ওঠ তুমি, ওঠ"—বাবলু কাঁদিতে থাকে।

মন্দাকিনী নীলুকে হাত ঝাপটা দিয়া সরাইয়া কহিলেন, "আমি যদি তোর মা হয়ে থাকি, ভগবান যদি মিথ্যে না হয়—অন্তর ভাল হবে না, হাতে হাতে ফল পাবে। সুলতার বুক যেন আমার মতোই খাঁ খাঁ করে রাতদিন। মুখপুড়ী! হারামজাদী!"

সুনীল নিরুপায়। এরূপ অবস্থায় কি যে করিবে ভাবিয়া পায় না কথার পৃষ্ঠে কথা গড়াইয়া কি কথার অর্থ যে কি হইয়া দাঁড়ায়!...

ছি-ছি!...

খানিক বাদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। সমস্ত ব্যাপারটা এক অপরিসীম কদর্য্যতা লইয়া তার সারা মনে বিষের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে: কি বিশ্রী মুখ মা'র! স্নেহ অন্ধ, এ কথা সে বোঝে। ক্রোধ সময় সময় শিষ্টতার সীমা ছাড়াইয়া যায়, একথাও সে মানে। কিন্তু এ কি ইতরতা! অথচ সে তারই মা! অসহায় মাতৃস্নেহের সারা অঙ্গে পক্ষাঘাত' আতিশয্যের অহঙ্কারে এতটুকু আঘাত সহিতেও অক্ষম!

"মা তুমি কেঁদো না আর"

নীলুর সহৃদয় কণ্ঠস্বর।

খানিক বাদে সমব্যথিত বাবলু ডাকে, "মা তোমার পায়ে পড়ি— ওঠ এবার।"

সুনীলের কানে ভাই বোনের কথাগুলি যেন তীরের মত বিঁধিয়া যায়। মা, মেয়ে আর ছেলে এই তিন জনে মিলিয়া এখন সুনীলের বিরুদ্ধে যেন প্রতিপক্ষ দাঁড়াইয়াছে। সুনীল যেন আর আপন নয়। খানিক আগে অমন স্নেহকাতর ভাইটির এখন আলাদা রূপ। ছোট বোনটি দাদার দিকে কেমন সলজ্জ সত্রাস দৃষ্টিতে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া নিল। এই সংসারের মধ্যে যেন এক ভাগ-বাটোয়ারার মামলা রুজু হইয়াছে চমৎকার! সুনীল শক্ত করিয়া বারান্দায় একটা খুঁটি ধরিয়া দাড়াইয়া থাকে বহুক্ষণ।

মন্দাকিনীর গর্জন বর্ষণের পালা শেষ হইয়াছে: এবার রুদ্ধ-অভিমানে

বিছানা লইলেন। বাবলুও সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় মার কোলের কাছে শুইয়া পড়িয়াছে সমবেদনা জানাইতে। কি যেন সে বলিতে চায়। দাদার উপর এখন তার অপরিসীম অভিমান। নীলুও মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া ভাবিতেছে খণ্ড প্রলয়ের কথাটাই। তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া সকল অস্পষ্ট কথার মধ্যে এই একটা কথাই সে বেশ স্পষ্ট বুঝিয়া লইয়াছে— অনুদি আর দাদার সঙ্গে কেমন যেন একটা কি ব্যাপার ঘটিয়াছে যার জন্য মা অমন করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত ব্যথা পাইয়াই মাটির উপর বার বার মাথা ঠুকিয়া কপালটা ফুলাইয়া ফেলিয়াছেন। দাদা এত নিষ্ঠুর!···

সুনীল আরও খানিকক্ষণ বাহিরে কাটাইয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। ছি-ছি-ছি! মাকে সে ইতর বলিল কোন মুখে?

মানদা বাড়ী ছিল না। পাড়া বেড়াইয়া এই মাত্র ঘরে ঢুকিল। তাকে দেখিয়া সুনীলের সর্ব্বাঙ্গ রাগে রোষে জলিতে থাকে। সে-ই যত অনিষ্টের গোড়া। কালই সে যাবার আগে ঠাকুরদাকে বলিয়া যাইবে—মানদা যেন এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় আর কোনদিন না ঢোকে।

মানদা মন্দাকিনীকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া আন্দাজে সব বুঝিয়া লইল! তারপর রান্নাঘরের পিছনে কল্যকার কয়লা ভাঙ্গিয়া রাখিতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরে। আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া অন্ধকারে সুনীল কেবল এপাশ ওপাশ করে। ঘুম নাই চোখে! সারাদিনটা কেবলি

ঘুরপাক খায় মনের মধ্যে। ঠাকুরদাকে সুনীল যাহা বুঝাইয়াছে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া মন্দাকিনী বুঝাইয়াছেন তার উল্টা কথা। আর এক পালা কুরুক্ষেত্র বাধিতে পারে নাই শুধু ঠাকুরদার মধ্যস্থতায়।...শেষকালে সব কথা জানাজানি হইয়া গেল। ঠাকুরদাও বুঝিলেন সব। তবুতো আসল ব্যাপার এখনো কাহারো জানিবার কথা নয়। অণিমাকে যে আজ সে চুমু খাইয়াছে এমন ঘটনা ঠাকুরদাও অনুমান করিতে পারেন না, মাও বুঝি অতদূর অগ্রসর হইতে রাজী নহেন। তাই যদি হয়, তবে মার এই প্রবল প্রতিরোধে আপত্তি জানাইবে এমন মনের জোর কোথায় সুনীলের? মার সন্দেহের মূলে কি কোন সত্যই নাই? আর সত্য যদি থাকেই, সুনীলের স্বীকার করিতে এত দ্বিধা কেন? অণিমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে কিনা ঠাকুরদার অমন স্পষ্ট প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব দিতেই বা সুনীল পারিল না কেন? সুনীল কেন এই আসল কথাটাই এড়াইতে চাহিয়াছে প্রাণপণে? তবে অণিমাকে লইয়া তাহার উদ্দেশ্য কি?

না, অণিমাকে সে বিবাহ করিবে। ঠাকুরদাদা জানুক, নাও তাহার পরিণামজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবক নয়। সারা গ্রামে তিলকে তাল হইতে দিয়া শেষকালে এক দরিদ্র অনূঢ়া মেয়েকে সে বুঝি বিপদে ফেলিবে! সব দিক বজায় রাখিবে সুনীল। মার অহঙ্কার ভাঙিয়া দিবে। অত দাপট কিসের জন্য?

মনে মনে নানা প্রশ্নের জবাব বকিয়া, নানা সমস্যার সমাধান করিয়া, নিজের প্রতিটি কার্য্যের সমর্থন গাহিয়া সুনীল যখন ঘুমাইয়া পড়িল রাত তখন অনেক।

পরদিন ভোর বেলা। ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানার উপর শুইয়া থাকিয়াই সুনীল টের পায়, তাহার বাঁ হাতের কনুইএর একটু উপরেই সেই মাদুলিটা বাঁধা। কাল রাত্রে কখন যে মন্দাকিনী নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া সন্তর্পণে তাঁহার কাজ হাসিল করিয়া গিয়াছেন তাহা ত্রিভুবনে আর কাহারো জানিবার কথা নয়। যাক্, মঙ্গলবারের রাত্রিটা মন্দাকিনী কিছুতেই পার হইতে দেন নাই।—অমোঘ মঙ্গলবার!

দশ

মাদুলী আর বেলপাতার মহিমা অপার। পরদিন ছেলে একবারও বাড়ীর বাহিরে যায় নাই। মন্দাকিনী নিশ্চিন্ত। খুশি মনে আজ রান্নাঘরে সব ভাজিতেছেন—সব ভাজা খাওয়াইতে কেবল অনিমাই জানে না! ক্ষীর আর নারকেল একসঙ্গে জ্বাল দিলেন, মাদুলীর মত এক একটা পুলি বানাইলেন, ঘিয়ে ভাজিয়া থালায় সাজাইয়া রাখিলেন—কাল দুধ আসিলে রসপুলি করিবেন। তাহার হাতের তৈরী খাবার একবার যে খাইয়াছে চিরদিন সে তাহার সুখ্যাতি করে। তাঁর হাতের রান্নার সঙ্গে নাকি এ গাঁয়ের আর কাহারো তুলনা !...

সন্ধ্যা হইয়াছে বেশিক্ষণ হয় নাই। মন্দাকিনী তাড়াতাড়ি বাকি কাজ সব সারিয়া লইতে চান। ভাত আর মাছের ঝোলটা নামাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত। তারপর—তারপর খোকার কাছে গিয়া বসিবেন। আর ক'দিনই বা সে বাড়ী আছে। পুত্র না হয় সারাদিন মুখ বুজিয়া রহিয়াছে, মন্দাকিনীর অভিমান করিলে চলিবে কেন! তিনিই না হয় সাধিয়া কথা কহিবেন। লোকে বলে—কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা

কখনো নয়। কুপুত্র? কিছুতেই নয়। তাঁহার ছেলেকে পর করিবে সাধ্য কার!

হাঁড়িতে গলা-সমান জল চাপাইয়া দিয়া মন্দাকিনী আহ্নিক সারিয়া লইতে বড় ঘরে আসিলেন। মনে মনে বুঝি মহড়া দিয়া আসিয়াছেন, পুত্রের সঙ্গে কি কথা দিয়া সুরু করিবেন। কিন্তু—

নীলু আসিয়া মার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে, "মা, দাদা এই খানিক আগে বাইরে চলে গেল!"

মন্দাকিনীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া ওঠে। আবার! মেয়ের মুখের দিকে খানিক হতভম্বের মত তাকাইয়া রহিলেন। খানিক বাদে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করেন, "কখন গেল?"

"এই তো খানিক আগে—তুমি যখন ও-ঘরে মাছ সাঁতলাচ্ছো।"

"না-রে, ঐ যে তোর দাদার জামা রয়েছে আলনায়। বাইরে গেলে বুঝি জামা পরে যেত না? বার-বাড়ীতে গেছে হয়তো।"

"না মা, আমি যেতে দেখেছি। অনুদিদের বাড়ীর দিকেই তো গেল!—বাক্স থেকে আর একটা নতুন জামা বার করে পরে বেরুল। ঠাকুরদাদাকে বলে গেল, একটু বাইরে যাচ্ছি দাদু।"

মন্দাকিনীর মাথাটা ঝিমঝিম করে। সন্ধ্যা-আহ্নিক এখন শিকায় তোলা থাক। আবার? এরি মধ্যে? মন্দাকিনীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা কম্পনের তরঙ্গ বহিয়া যায়—বুকের মধ্যে এখন অসহ্য তোলপাড়! আবার নীলুকে চাপা গলায় বলিলেন, "খুকী তুই রান্নাঘরে গিয়ে একটু বস্—ফেন উতলে উঠলে—"

"আমি একা থাকতে পারব না—ভয় করে।"

"তবে ঘরেই থাক, বাবলু খেতে চাইলে বলিস এখনো ভাত হয়নি। আমি এলাম বলে! বুঝেছিস?"

নীলু ঘাড় নাড়ে।

মন্দাকিনী নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন। এই রাত্রিবেলা একাই রওয়ানা হইলেন অণিমাদের বাড়ীর উদ্দেশে। তাঁর কাছে এখন কোন বাধাই বাধা নয়। তাঁর গমন পথে এখন বাঘ, ভালুক, জল, ঝড়, ভূত, ভূমিকম্প—যত বড় বিপদই ঘটুক না কেন, মন্দাকিনী এখন প্রাণপণ করিয়া সন্তর্পণে ও-বাড়ীর বড় ঘরের পিছনে গিয়া আবছায়া অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া কান খাড়া রাখিয়া অন্ততঃ কয়েক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়াইবেন নিঃসন্দেহে। বেলপাতাটা এখনো বুঝি তাজাই আছে!... ইহারই মধ্যে?......

সুনীল সত্যই আবার অণিমাদের বাড়ী গিয়াছে। না গিয়া পারে না যে! সারাদিন ঘরের মধ্যে শুইয়া বসিয়া বই পড়িয়া সময় কাঠাইয়াছে যা হক্ করিয়া। দত্ত বাড়ী বিসর্জ্জন দেখিতেও যায় নাই; কিন্তু সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনের উন্মুখ সুনীল একেবারে উন্মন হইয়া ওঠে। এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে—সটান চলিয়া আসে অণিমাদের বাড়ী।

কিন্তু এ কি দুর্দ্দৈব! সুনীলকে দেখিয়া সুলতা দুই গণ্ড অশ্রু-প্লাবিত করিয়া যে কাহিনী শোনাইলেন তাহা সংক্ষেপে এই:

আজ দত্ত বাড়ীর প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতে গিয়া সুলতা যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া ফিরিয়াছেন। তাঁর সঙ্গে অণিমাও ছিল। পাড়ার মেয়েমহলে সুনীল আর অণিমাকে লইয়া নাকি বিশ্রী সব কাণাঘুষা

চলিতেছে। এ-কথায় সে-কথায় শেষকালে গোপনকরা কথাটাই উঠিয়া পড়ে। আর যায় কোথায়! শ্যামলাল সোমের পিশীর সঙ্গে সুলতার বেশ এক পালা কলহ হইয়া গিয়াছে দত্তদের চালিতাতলায়। ঝগড়ার মুখে এমন সব কথাও নাকি বাহির হইয়া পড়িয়াছে যাহাতে এখন এই অরক্ষণীয়া মেয়েটাকে লইয়া সুলতা কেমন করিয়া লোকের কাছে আর মুখ দেখাইবেন! ইত্যাদি।

আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে সুলতা জানাইলেন, "বাদল, একে তো লোকে বিয়ের সম্বন্ধ এলেই নানা কথা বলে ভাঙ্গানি দেয়, এখন এই হতভাগীকে আমি পার করব কেমন করে? মেয়েমানুষের নামে কলঙ্ক রটার চেয়ে যে মরাও ভাল। ওর তো মরণও হয় না ভগবান!"

সুনীল একেবারে হতবাক্! এ সব কি কথা! ···আশ্চর্য্য! গ্রামের লোকের কল্পনার দৌড় কি সাঙ্ঘাতিক! ওদিকে অণিমাও বিছানার এক কোনে উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

"লোকে তিলকে তাল করে তা সহ্য হয় বাদল," সুলতা যেন এক বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দিদি কোন্ মুখে লোকের কাছে এ-সব কথা বলে বেড়ায়? আমার মেয়ের নামে কলঙ্ক রটলে সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলের মুখও যে খাটো হয়!"

"মা এ-সব বলেছে?"

"হ্যাঁ"

"মিথ্যে কথা", সুনীল উত্তেজিত হইয়া ওঠে।

"পদি পিশীও তো তোমার মার কথাই—"

"পদি পিশী চিরকালের মিথ্যেবাদী!" সুনীল সুলতার কথায় বাধা

দিয়া তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে থাকে, "আমার মা প্রাণ গেলেও এমন সব কথা মুখে আনতে পারে না। এসব দুষ্টু লোকের চক্রান্ত।"

মন্দাকিনী চুপ করিয়া যান। অণিমা তেমনি নিঃশব্দে কাঁদিতেছে—তার বুকের কাছে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে চূড়ান্ত অপমান। সুনীল চোখ ফিরাইয়া নেয়। অসহ্য!

খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল অণিমার কাছে—বিছানার উপর। সুলতা যে মেঝের উপর বসিয়া চোখের জল মুছিয়া চলিয়াছেন সে-কথাটা যেন ভুলিয়াই গেল।

"অনু!"—আর্দ্র কণ্ঠস্বর সুনীলের।

জবাব দিল অণিমার অবরুদ্ধ ক্রন্দন।

"অনু, তুই কি পাগল হয়েছিস্! লোকের কথায় অমন ভেঙ্গে পড়লে বুঝি চলে! ওঠ্।—গাঁয়ের এই শেয়াল কুকুরগুলোর চিৎকার কানে তুলতে নেই।" সুনীল তার ডান হাতখানি অণিমার আলুলায়িত মাথার উপর রাখিতেই তার নিঃশব্দ ক্রন্দন এবার সশব্দে ফাটিয়া পড়ে।

"ওঠ্। তুই আচ্ছা বোকা মেয়ে।—ওঠ্ এবার।" অণিমাকে হাত ধরিয়া তুলিতে যায় সুনীল। বেলুনের মত সুডোল দুখানি হাত! সুনীলের সর্ব্বাঙ্গে খেলিয়া যায় সুযোগের অপূর্ব্ব পুলক। তার অকপট অনুকম্পার সর্ব্বাঙ্গে গুটিকয়েক মধুর মুহূর্ত্ত পাতলা মোহানুভূতির প্রলেপ মাখাইয়া দেয়। অণিমার হাত দুটি কি নরম!

সুনীল বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া লয় আঁচলে-মুখ-ঢাকা অণিমাকে—দেখে তার সারা দেহ। গ্রামের কুচক্রী মেয়েমহল চাপা পড়ে। ভয় আর ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে। কাঁদিলেও

কি সুন্দর দেখায় এই মেয়েটাকে! সুনীলের মনের আকাশে জ্বলজ্বল করে একখানি হাজাররঙা রামধনু। বকুলতলা তো বকুলতলা, এখন—এই সদ্য মুহূর্তে—অণিমার এতটুকু অসম্মানের প্রতিকারে সুনীল একাই গোটা দুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করিতে পারে। তার মনের মধ্যে মাথা চাড়া দেয় দুর্দ্দমনীয় এক বুনো পৌরুষ!

অণিমা উঠিয়া বসিয়া মুখে আঁচল চাপিয়া মন্দীভূত ক্রন্দনের রাশ টানিতেছে।

"অনু!"

অণিমা তেমনি নিরুত্তর।

"নিজের মনে সাহস থাকলে দুনিয়ায় কে কী করতে পারে অনু?"—

জবাব দিলেন সুলতা, "গ্রামের লোককে তো চিনিস্ না বাদল—দূরে থেকে ভুলে গেছিস্ সব। এরা না করতে পারে এমন কিছু নেই।"

"এই গাঁয়ের হাত থেকে ওকে আমি মুক্তি দেব ন-কাকীমা," সুনীল উচ্ছসিত হইয়া ওঠে, "পারবি অনু?—আমার সঙ্গে কলকাতা যাবি? মনে সে বল আছে?"

অণিমা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া চুপ করিয়া আছে।

সুলতা স্তিমিত আলোকের শঙ্কিত শিখাটা চড়াইয়া দেন। একি কথা! বাদলের সঙ্গে মেয়ে তাঁর কলিকাতায় যাইবে, এ কথার অর্থ কি?

"বল, যাবি আমার সঙ্গে?"

অণিমা জবাব দেয় না। কিন্তু তাহার মর্ম্মমূল অবধি যেন কাঁপিয়া ওঠে। বাদলদা তাকে সত্যই ভালবাসে তবে? যার প্রবল প্রতিরোধ দু'হাতে সরাইয়া আজ সে অণিমার নাগালের মধ্যে আসিয়া সম্পূর্ণ ধরা

দিতে চায়? অণিমার নিদারুণ অপমানের কালো মেঘের গায় ভরসার আলোক-রেখা ছুঁইয়া কাঁপিয়া যায়! পরাজিত করিয়াছে প্রতিবাদী মাতাকে, জয় করিয়াছে তাঁর মাতৃভক্ত পুত্রকে? কলিকাতা কোন্ ছার বাদলদার সঙ্গে অণিমা এখন জাহান্নামে যাইতেও প্রস্তুত। সে যাইবে!

"অনু, বল্, আমার সঙ্গে কলকাতা যেতে সাহস আছে তোর? বাবা মার আপত্তি, লোকনিন্দা, ভাই-বোনদের মায়া—পারবি সব কাটাতে?"

নির্ব্বাক অণিমার সর্ব্বাঙ্গ সায় দেয়।

"পারবি যেতে আমার সঙ্গে?"

"ও সব কী বলছিস্ বাদল?" সুলতা বাধা দিলেন।

সুনীলের এতক্ষণে হুঁস হয়, এ-ঘরে আর একটি তৃতীয় প্রাণীও আছে। নিজেকে সামলাইয়া কহিল, "ঠিকই বলছি ন'কাকীমা। ওকে আমি কলকাতা নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব। মেয়েদের বোর্ডিং-এ থেকে পড়বে। এখনো সময় আছে। তুমি অমত করো না ন'কাকীমা! মেয়েদের বিয়ে ছাড়া যেন আর কোনো কথা তোমরা ভাবতেই পারো না। মেয়ে বলে কি সে—" সুনীলের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। সর্ব্বনাশ!

বাহিরে মন্দাকিনীর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, "সুলতা।"

"দিদি?"

"হ্যাঁ, আমি।"

সুলতা তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইয়া দুয়ারের কাছে আগাইয়া যান।

"আমার ছেলেকে নিতে এসেছি।" বলিতে বলিতে মন্দাকিনী নিজেই দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে ঢোকেন।

সুলতা, অণিমা, সুনীল—তিনজনই হতবাক্। ঘরখানির মধ্যে যেন এই মাত্র বিনা মেঘে একটা বজ্রপাত হইয়া গেল।

মন্দাকিনী ছেলের দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া লইয়া সুরু করিলেন, "সুলতা, ছেলে আমার—তোর নয়।"

"সে কি কথা দিদি!"

"চুপ কর সুলু। আর ছেনালি করিস্ নে। তোদের চিন্‌তে আর বাকি নেই আমার। তোর পেটে পেটে এতও ছিল!"

সুনীল এই অভাবিত ব্যাপারে প্রথমটায় ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া এবার মনে মনে ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে।

"তুমি হঠাৎ রাত্তিরে একা এ-বাড়ী চলে এলে কেন?"—রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করে পুত্র।

"এসেছি তোকে নিয়ে যেতে," মন্দাকিনী চৌকির কাছে আগাইয়া আসেন সদর্প ভঙ্গীতে।

"আমি কি কচি খোকা যে, একা বাড়ী ফিরে যেতে পারব না, তাই নিয়ে যেতে এসেছ!"

"হ্যাঁ, তুই আমার কাছে এখনো সেই খোকাই। বাড়ী চল।"

"এখন যাব না আমি—তুমি যাও।"

মন্দাকিনী আদেশের সুরে কহিলেন, "ওঠ্, বলছি।"

"কেন!"—প্রশ্ন নয়, সরোষ প্রতিবাদ।

ছেলের একখানি হাত ধরিয়া একটা হেঁচকা টান মারেন মন্দাকিনী, "বাড়ী চল!—আমি বল্‌ছি।"

"যাব—এখন নয়। আগে তুমি যাও।"

"এক্ষুণি যেতে হবে তোকে।" মন্দাকিনীর দৃঢ় কণ্ঠ দৃঢ়তর হয়।

"তুমি আগে এ বাড়ী ছেড়ে যাও, তারপর আমি যাব।"

"না, এখনি যেতে হবে। নইলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব এখানে।"

সুনীল অনড়, অটল।

অণিমার এতক্ষণের সভয় দৃষ্টি এবার কিন্তু রূপ বদলায়। কেমন এক চাপা দ্যুতি খেলিয়া যায় তার সারা মুখেচোখে।

মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বর সহসা যেন বয়েলিং পয়েন্ট থেকে ফ্রীজিং পয়েন্টে নামিয়া আসিয়াছে। ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "যাবি না?"

"না" স্পষ্ট জবাব।

"আমি তোর কেউ নই?"—সকরুণ আবেদন!

"সে সব কথা পরে শুনব। এখন তুমি যাও বলছি। বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে, সে-কথা ভুলো না।"

"যত দোষ আমার, আর ওরা কোন দোষই করল না? হায় ভগবান!"—মন্দাকিনীর সত্যই মাথা খারাপ হইয়াছে। স্থান, কাল, পাত্র—এখন কোন কথা কোন বিবেচনাই তাঁর নাই। যেন সমস্ত ব্যাপারটাই এক স্বপ্নের মধ্যে ঘটিতেছে।

"তুমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাও, বলছি। কোঁদল করতে হয় বাড়ী বসে গিয়ে করো।"

"তাই যাচ্ছি।—কিন্তু বাড়ী ফিরে দেখবি, তোর মা আর নেই! এই শেষ কথা বলে গেলাম।"—ঝড়ের বেগে মন্দাকিনী ঘরের বাহির হইয়া যান।

সুনীল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল স্তব্ধের মত। অণিমা এবার সরিয়া

বসে। এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে সে বাদলদার কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল। হুঁস ছিল না, নিজেরই অজানিতে কখন সে সুনীলের কোঁচার খুঁট শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির মতই এক অন্ধ স্বতঃপ্রেরণায়। এবার দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইয়া আসে। লজ্জা দেখা দেয়। পা-ভাঙ্গিয়া দূরে সরিয়া বসে। উঃ! কি এক মহা বিপদ যেন পার হইয়াছে।

সুনীল নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়ায়। সুলতার মুখে কথা নাই। অণিমা নির্ব্বাক।

রাস্তার ত্দিকে সন্ধানী দৃষ্টি চালাইয়া সুনীল দ্রুতপদে পথ চলিয়াছে। পুকুরপাড়ে আসিয়া বার দুই এপা'র ওপার দেখিয়া লইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। পুকুরের জল স্থির—নিশ্চল। বুকটা তবু ঢিব্ ঢিব্ করে। কানে বাজে মায়ের শেষ কথা কয়টি—"বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখবি, তোর মা আর নেই।" শেষকালে মা একটা অসম্ভব কাণ্ড করিয়া বসিলেন না তো? বিচিত্র কি! একে তো মেয়ে জাত, তায় যে দুর্জ্জয় অভিমান!

মরা অত সহজ নয়! মন্দাকিনী মরেন নাই, মরিতে পারেন না, মরিবেনও না। যেমন উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়াছিলেন তেমনি নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

নিঃশব্দে আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিলেন। বড় ঘরে যান নাই, পাছে শ্বশুরের কাছে এখন ধরা পড়িয়া যান। তাঁর যে কপাল ভাঙ্গিয়াছে, নিজের ছেলে পর হইয়া গেল, সেই চূড়ান্ত দুর্ভাগের কথা শ্বশুরের কাছে বলিবেন আর কোন্ মুখে! রান্নাঘরে একা একাই খানিক চাপা কান্না কাঁদিয়া লইলেন। ক্রন্দনই এখন শেষ সম্বল তাঁহার। তাঁহার এত

আশা, এত ভরসা, এত সব জল্পনা কল্পনা, সব কিছু শেষ হইল এতদিনে। বড় ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া সুখ-সম্পদের যে এক সাতমহলা সৌধ তিনি রচনা করিয়া আসিয়াছেন আজ তাহা ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া ধূলায় মিশিয়া যায়। বড় গলা করিয়া তিনি কথা বলিতে গিয়াছিলেন, বড় মুখ লইয়া আজ সুলতার ঘরে ঢুকিয়াছিলেন—পঁচিশ বছরের একচেটে অধিকার বুঝিয়া লইতে! আর, ছেলে তাঁহাকে শত্রুর মুখের উপর এতখানি অপমান করিয়া বসিল! গর্ভধারিণীর এত অনুনয়ে একটিবার অণিমার কাছ হইতে এতটুকু দূরে সরিয়াও বসিল না! কপালে এ-ও ছিল! সুলতা আর সুলতার মেয়ের সামনে তাঁর "খোকা" তাঁকে শেষকালে অমন করিয়া চোখ রাঙাইল! হায় ভগবান...

"মা ফিরে এসেছ?"—নীলু ডাকে।

মন্দাকিনী সাড়া দিবেন কি!' চোখে মুখে আঁচল চাপিয়া কান্না রোধ করিতে চান প্রাণপণে।

ব্রজনাথ ডাকেন, "বৌমা, তুমি এই রাত্তির করে কোথায় গিয়েছিলে?"

কোন সাড়াশব্দ নাই।

বৃদ্ধ ব্রজনাথ উঠিয়া রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ান।

"বৌমা, আমায় তোমরা সব কথা লুকোচ্ছ কেন?—কী হয়েছে বলো।"

মন্দাকিনী জ্বলন্ত উনানের কাছে বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এদিকে টগবগ করিয়া হাঁড়ির ভাত ফুটিতেছে সেদিকে খেয়ালই নাই। খানিক আগে ও-বাড়ীতে সুনীলের বিমুগ্ধ

দৃষ্টির সম্মুখে অণিমার ফুলিয়া ফুলিয়া নিঃশব্দ ক্রন্দনের মতই মন্দাকিনীর সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে অসহ্য জ্বালা, চূড়ান্ত অপমান।

"বৌমা, ভুল করো না! এখন রুখতে যেয়ো না—বাধা দিতে গেলে হবে হিতে বিপরীত।"

"কী!! বাধা দেব না?" মন্দাকিনী এবার ছ্যাঁক করিয়া ওঠেন। "একশ'বার বাধা দেব। ও আমার ছেলে নয়? আমার মঙ্গল অমঙ্গলের ভয়ডর আছে না? হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর খুইয়ে বসে আছি, এবার বুক খালি হক একে একে। এই আপনারা চান নাকি? ওর পাপে আমার নালু বাবলু বুঝি টিকে থাকবে ভেবেছেন!"

খানিক আগের নিরীহ অসহায় মন্দাকিনী এবার ভয়ঙ্কর উগ্র হইয়া ওঠেন। ব্রজনাথ খানিক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘরে ফিরিয়া আসেন। এ কি অনাসৃষ্টি। বৃদ্ধের চোখের কোণে বোধ হয় দু' ফোঁটা জল দেখা দিল আজ। মৃত পুত্রের কথাটা হঠাৎ বড় বেশী করিয়া মনে পড়ে—শোকটা আবার নূতন করিয়া দেখা দিতে চায়।

সুনীল বাড়ী ঢোকে এমনি সময়ে। ব্রজনাথ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বাবলু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মানদা কাজ সারিয়া চলিয়া গিয়াছে বহুক্ষণ। গোটা বাড়ীটা বিসদৃশ ভাবে নীরব—এই বিশ্রী নির্জ্জনতার মধ্যে সারা সংসারের নিন্দা, ঘৃণা, আর অভিযোগ জমা হইয়া আছে।

সুনীল পাঞ্জাবীটা খুলিয়া আলনায় রাখিয়া বারান্দার তক্তপোষে একটা বালিসে মাথা রাখিয়া কাত হইয়া পড়ে। কি সে করিতেছে, কি

করা উচিত এখন, কি হইলে সব দিক রক্ষা পায়—একূল, ওকূল, দুকূলই বজায় থাকে, এসব কোন ভাবনা কোন সমস্যাই আর তার মগজে নাই। একটা প্রবল উত্তেজনায় মস্তিষ্কের ক্রিয়া-শক্তি যেন বন্ধ হইয়াছে, বালিশে মাথা এলাইয়া দিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে নিষ্পলক

মন্দাকিনী ঘরে ঢোকেন। সুনীল সহজ চোখেই তাকায় আজ। আর লজ্জা নাই, দ্বিধা নাই, লুকাইবার দায় নাই। মা নিজেই সংশয়-সঙ্কোচের পাতলা পরদাটুকু ছিঁড়িয়া সরাইয়া দিয়া বসিয়া আছেন। এখন বাকী শুধু মা-ছেলেতে মুখোমুখি একটা বোঝাপড়া করিয়া লওয়ার।

মন্দাকিনী খানিক এদিক ওদিক করিয়া আলনার কাছে গিয়া দাঁড়ান। সুনীলের পাঞ্জাবীটার নীচের একটা পকেটের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে অণিমার দেওয়া সেই রুমালখানির একটা প্রান্ত—নিজের হাতে ফুল তোলা, নীল অক্ষরে সুন্দর করিয়া সুনীলের নাম-লেখা সস্তা সাধারণ কাপড়ের, বড় আদরের সেই উপহারটুকু!

মন্দাকিনীর আপাদ মস্তক দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। যত মাখামাখি যত ঢলাঢলি করিতে হয় করুক—কিন্তু সে-সব এ বাড়ীর বাহিরে। এখানে সে এতটুকু অনাচার সহ্য করিবেন না—অনাসৃষ্টির কোন চিহ্ন রাখিতে দিবেন না। এটা তাঁর স্বামীর ভিটা, শ্বশুরের জন্মস্থান! সুতরাং—

ছেলেকে দেখাইয়াই একটা চিলের মত ছোঁ মারিয়া পকেট হইতে রুমালখানি লইয়া আর কোন দিকে না চাহিয়া মন্দাকিনী সটান চলিয়া যান রান্নাঘরে।

সুনীলও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই। খানিক ইতস্তত করিয়া রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়। যাহা অনুমান করিয়াছে

তাই। উনানের মুখে অণিমার রুমালখানির অবশিষ্টটুকু তখনো জ্বলিতেছে। মন্দাকিনী জ্বলন্ত কাঠটা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিলেন উনানের মুখে !

যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে পুত্র ফিরিয়া আসে। মন্দাকিনীর দৃষ্টি নিবদ্ধ কিন্তু ঐ জলন্ত উনানের মধ্যে ! তাঁর মনের মধ্যেও জ্বলিতেছে অমনি আগুন !

দৃঢ় মুষ্টি আরও দৃঢ় করিয়া একটা মাতালের মত টলিতে টলিতে পুত্র যায় বাইরের ঘরে। দারুণ আক্রোশে এখন ফাটিয়া পড়িতে চায়। সে ক্রোধ যেন মুখের ভাষায় কুলায় না, গায়ের জোরেও পোষায় না। প্রয়োজন এখন চূড়ান্ত রকমের কোন এক অনাসৃষ্টির, চাই একটা বড় রকমের অপঘাত ! কি সে করিতে পারে ?

একটা ছুরি—অন্ততঃ একটা ধারালো ছুরি চাই এখন সেই ছুরি দিয়া—আর কিছু করিতে না পারুক, সেই ছুরি সে নিজের হাতে বসাইয়া দিবে। বাহির হউক রক্ত, মুক্তি পাক্ নিরুদ্ধ অন্ধ আক্রোশ ঘরের মধ্যে কি এ সময় একটা ছুরিও থাকিতে নাই ?—আর এক টুকরা সাদা কাগজ ? হাতের আঙুল দিয়া লাল টকটকে তাজা রক্তে বড় বড় এক একটা অক্ষর লিখিয়া মাকে গিয়া এখনি দেখাইবে :—অণিমাকে আমি চাই, চাই, চাই। কি করিতে পার কর।

প্রবল উত্তেজনায় ছটফট করে সুনীল। টেবিলের একটা ড্রয়ার টান মারিয়া খুলিয়া ফেলে। অদ্ভুত যোগাযোগ ! যত রাজ্যের পুরান চিঠিপত্র, ধোবার হিসাব আর বাজারের চিরকুটের উপর লণ্ঠনের ক্ষীণ

আলোতে চক্‌চক্ করে ঠাকুরদার কলমকাটা নতুন ছুরিখানি। সে কি !...

সর্ব্বনাশ !...ছেলেপেলের ঘরে এমন ধারালো ফলা ঠাকুরদা অমন করিয়া খুলিয়া রাখিয়াছেন ? চট করিয়া বাটের মধ্যে ফলাটা ভরিতে ভরিতে সুনীল ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। তারপর, মাস দুই আগে কেনা ঐ নতুন ছুরিখানি সমস্ত গায়ের জোর দিয়া সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল—দক্ষিণের ঘরের টিনের চালার উপর দিয়া, ছোট বেগুনগাছটার মাথা ডিঙাইয়া, কাঁচামিঠা আমগাছের একটা নিরীহ প্রশাখায় আলোড়ন তুলিয়া, ছুরিখানি টুক করিয়া গিয়া পুকুরের জলে পড়ে—ওপারের কাছাকাছি।

এগার

পরদিন সকালে।

আজ শুধু মন্দাকিনীই নয়, গোটা সংসার সুনীলের সঙ্গে অসহযোগ সুরু করিয়াছে। তাহার কাছে আসিলে সকলেরই মুখে কথা বন্ধ হয়। সে কি একটা হিংস্র জন্তু না এক ঘৃণ্য জীব ?..

চা আসিল আজ বাবলুর হাতে। ঐ একরত্তি ছেলে কোন রকমে পেয়ালাটা টেবিলের উপরে রাখিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়ে—ভয়ে, না লজ্জায়, না অভিমানে, কে জানে। কি সে বুঝিয়াছে, কি সে জানিয়াছে সেটা বড় কথা নয়। এই বয়স হইতেই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে এমনভাবে প্রতিপক্ষ দাঁড় করাইবার ইতরতায় সুনীলের মন বিষাইয়া ওঠে। আগুন লাগিয়া সর্ব্বস্ব পুড়িয়া খাক হইয়া গেলেও যেন তাহা সওয়া যায়—সুনীলের অপরাধ যেন তার চেয়েও বড় বিপদ, তার চেয়েও মারাত্মক ক্ষতি।

সারা দিন সুনীলও পাণ্টা অসহযোগ চালাইয়াছে। আজ আর বাড়ীর বাহির হয় নাই। কাহারও সঙ্গে কথা বলিবার

চেষ্টাও করে নাই। বারান্দায় বেতের আরাম কেদারায় গা-ভাসিয়া বসিয়া পড়িয়া নদীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া সময়টা কাটাইয়া দিয়াছে।... যাক, আর বড় জোর ঘণ্টা বিশ-বাইশ। কাল এ সময় সে ষ্টীমারে—পদ্মা বক্ষে। কালই সে যাইবে, আর সে একটা দিন বেশীও থাকিবে না। আজ ঢাকা মেলে রওয়ানা হইতে পারিলেই যেন ভাল ছিল। একটা দিনের হাত হইতে রেহাই পাইত!

"ঠাকুরদা!"

ব্রজনাথ আলাপের সুযোগ পাইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ান। নাতীর আচরণে দুঃখ তিনিও পাইয়াছেন, কিন্তু মন্দাকিনীর মত তাঁর স্নেহের সম্পত্তি নীলামে ওঠে নাই।

"ডাকছিস?"

"চলো ঘরের ভেতরে। তোমার সঙ্গে কথা আছে অনেক।"

"চল্।"

ঘরের মধ্যে আসিয়া টেবিলের এককোণে বসিয়া পড়িয়া সুনীল জানাইল, "ঠাকুরদা, আমি কালই যাব।"

"কালই?"

"হ্যাঁ, কালই ঢাকা মেলে।"

ব্রজনাথ আর কোন উচ্চবাচ্য করেন না। সুনীল নিরাশ হয়—বেশ একটা আঘাত পায় মনে। ভাবিয়াছিল, তার যত অপরাধই থাকুক, ঠাকুরদা কথাটা শুনিয়াই ঘোর আপত্তি জানাইবেন। তাহার ছুটি ফুরাইতে এখনো যে পুরা পাঁচ দিন বাকি!

"আচ্ছা ঠাকুরদা! আমি কি এ সংসারের কেউ নই?"

"সে কি কথা!"

"তোমাদের ভাবগতিক দেখে তাই তো মনে হচ্ছে।"

ব্রজনাথ এ কথার কোন জবাব দিতে পারেন না।

"আমায় তোমরা একবার ডেকেও জিগ্‌গেশ করলে না, ব্যাপার কী! অন্ততঃ তোমার কাছে সব কথা আমি নিশ্চয় বলতাম ঠাকুরদা। সন্দেহ আর অনুমানকে প্রশ্রয় দিয়ে বাড়ীর আবহাওয়া কী বিশ্রী করে তুলেছ তোমরা! নীলু আর বাবলুও কিনা আমাকে পর মনে করে!"

"কী তুই বলছিস পাগলের মতো!"

"পাগল কেবল আমিই নই, তোমরাও।"

বৃদ্ধ ব্রজনাথ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকেন। বলিবার মত কিছুই ভাবিয়া পান না। নাতী তাঁহার সেই নাতীই আছে। চলায় বলায় ঠিক তেমনটি! তবু কোথায় যেন একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

"ভাবছ ঠাকুরদা এসব কী বলছি আমি। ভাবছ, আমি আর তোমাদের মনের মতোটি নেই। অচেনা মনে হচ্ছে, না? দুদিন বাদে আমায় আরো অচেনা মনে হবে।"

মন্দাকিনী ঘরের পিছনে এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এবার সরিয়া যান নিশ্চিন্ত মনে। তাঁর শঙ্কা ছিল, শ্বশুর হয়তো নাতীকে ছুটির বাকি ক'টা দিন থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন। বিপদের গুরুত্ব তিনিও তবে বুঝিতে পারিয়াছেন! বাঁচা গেল।...

...কাল কেন, আজই যাক না। কোন আপত্তি করিবেন না

মন্দাকিনী—এক ফোঁটা চোখের জলও এবার পড়িবে না। ভালয় ভালয় বিদায় হউক! তাঁর কপালে এতও ছিল!...

চোখের কোণ জলে ভরিয়া আসে। আঁচলে মুখ মুছিয়া মন্দাকিনী বড় ঘরের পিছনে গিয়া ডাকিলেন, "মানার মা!"

"ডাকছেন বৌমা-দি ?"

"হ্যাঁ"—ধরা গলায় মন্দাকিনী কহিলেন, "তুমি একবার ঘোষের বাড়ী যাও না।"

"এই সন্ধ্যে বেলা ?"

"হ্যাঁ, খোকা কাল চলে যাচ্ছে।"

"সে কি, তেনার না আরো পাঁচ দিন থাকার কথা ?"

"তুমি মধু ঘোষকে গিয়ে বল, কাল সকালে যেন ২' সের ঘি দিয়ে যায়—কড়া পাকের ঘি দিতে বলো।—আর, কাল তিনটের মধ্যেই এক সের পাত ক্ষীর দিতে হবে, ভুলে যায় না যেন। পরশু দিন আমি ঘোষের পোকে বলে রেখেছি, ও যে কালই যাবে তা কি আর জানতাম তখন।"

"হাতের কাজটা সেরে পরে যাব'খন।"

"না, তুমি এক্ষুণি যাও মানার মা—দেরী করো না। কাল সকালেই—সবটা না পারে অন্ততঃ আধ সের ঘি যেন অতি অবশ্য দিয়ে যায়। বাকী দেড় সের যাবার আগে দিলেই হবে। কালই দাম পাবে, মনে করে বলো সেকথা।"

মানদাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠিতে হয়।

মন্দাকিনী পুত্রের যাত্রার ব্যবস্থা করিতে এখন হইতেই ব্যস্ত হইয়া

উঠিয়াছেন। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করিবেন না। অন্যান্য বছর এক দিন আগে থেকেই মন্দাকিনী আহার নিদ্রা যেন ভুলিয়া যান। এটা-ওটা-সেটা, কত কি-ই না দিতে চান পুত্রের সঙ্গে। থাকিয়া থাকিয়া মা-ছেলেতে হয় কথা কাটাকাটি। মন্দাকিনী যতই ঝঞ্ঝাটের মাত্রা বাড়ান, পুত্র ততই ঘোর আপত্তি জানাইতে থাকে, "এত সব আমি নিতে পারব না বলে রাখছি। গোটা সংসারটাই তুলে নিয়ে যাই তার চেয়ে।" মাও পাল্টা জবাবে অভিমান করিয়া বলেন, "বিদেশে যেন শুধু তুই যাচ্ছিস, কেউ কোন দিন যায়নি আর!—ভারী তো বোঝা! না হয় কুলি একটা বেশিই লাগলো। আমি এত কষ্ট করে এ-সব তৈরী করলাম, আর তুই দু'চার আনার পয়সাকেই বড় মনে করছিস?"

মা ও ছেলের সেই চিরাচরিত খুনসুড়ির পালাটা এবার বন্ধ। মন্দাকিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া যান।···সময় নাই হাতে। ক্ষীরের তক্তি ও নারকেলের চিংড়ি-পিঠা এবার আর হইয়া উঠিল না। সংবাদটা আজ সকালে জানিলেও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেন। এ দুঃখটা কাঁটার মত মনে বিঁধিবে সারা বছর! বিঁধুক। তবু···

মন্দাকিনী হাঁক ছাড়েন, "নীলু"

"কী মা?"

"শোন্"

মেয়ে আসিয়া কাছে দাঁড়ায়।

"চাবি নে, আলমারীর মাঝের তাকে কাগজে-জড়ানো মিছরি আছে—তোর সুন্দরপিসিকে এক দৌড়ে দিয়ে আয় গে—"

"এখনি ?"

"এক্ষুণি---এখনো সন্ধ্যা লাগে নি, এক দৌড়ে দিয়ে আয় গে। তাকে বুঝিয়ে বলবি, তোর দাদা কালই চলে যাচ্ছে। নারকেলের চিড়া আর জিরা করতে দিয়েছি। পরশু তা জ্বাল দেবার কথা ছিল, যেমন করেই হক আজ রাত্তিরেই যেন সব তৈরী করে ফেলে। ডঁসের মিছরি আছে ওখানে।—দেরি করিসনে আর, শিগ্‌গির যা।"

নীলু চাবি লইয়া প্রস্থান করে।

খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মন্দাকিনী সন্ধ্যা-প্রদীপ প্রস্তুত রাখিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া আসেন। নির্জ্জন ঘর পাইয়া হুহু করিয়া খানিক কাঁদিয়া লইলেন।

কেন যে কাঁদেন তা-ও ছাই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না! বার বার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান, পুত্রের সুমতি যেন বজায় থাকে—কাল বিকাল পর্য্যন্ত। সে যেন সত্য-সত্যই কাল চলিয়া যায়।...

যাহা হইবার তো হইয়াই গেল। যত আঘাত যত অপমানই পুত্রের কাছ হইতে পাইয়া থাকুন, শেষকালে তাঁরই জয় হইল। মার কথাটাকেই সে আর সবার উপরে স্থান দিয়াছে। তবু কাঁদেন। মন্দাকিনী নির্জ্জনে চোখের জল ফেলিয়া এই কয়দিনের গুরুভার খানিক হালকা করিতে চান। ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া বারান্দায় বহুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পুত্রের উপর মায়া হয়! পুত্র যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিয়া যাইতেছে, সে-কথাটা ধীরে ধীরে মন্দাকিনীর মনের মধ্যে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে ছুটি ফুরাইতে এখনো পুরা পাঁচ দিন বাকি, তবু পুত্র চারদিন আগে

—আগামীকাল কলিকাতা রওনা হইতেছে; কিসের জন্য, কার জন্য, মন্দাকিনী বুঝি তাহা বোঝেন না?...

সারা বছর যে-জন থাকে নির্ব্বান্ধব বিদেশে—জননীর নিকট হইতে বহু দূরে, যাহাকে দু'দিন কাছে পাইয়া মন্দাকিনীর বুক ভরে না, সেই ছেলেকে জোর করিয়া তিনিই আজ সরাইয়া দিতে চান! না হয় কাঁদিবেন, সারা বছর ভরিয়া না হয় মাঝে মাঝে চোখের জল মুছিবেন—তাও ভাল, তবু যাক সে, কালই যাক। আজকের ঢাকা মেলে চলিয়া গেলেও আপত্তি ছিল না, ক্ষতি ছিল না, দুঃখ ছিল না! মন্দাকিনী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেন।...

এদিকে বারান্দায় পুত্রও তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া লয়। ইহা ছাড়া আর কি উপায় ছিল?—আর কোন্ পথ? ও-কূলের মান রাখিতে গেলে এ-কূল ভাঙ্গে, এপারের মর্য্যাদা মানিলে ওপার বন্ধ্যা। দুই দিক হইতে দুই সহজ প্রবল প্রচুর আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া সুনীলের মনের উপর এ দু'দিন অহর্নিশ ঘুরিয়া মরিয়াছে এক একটা ক্ষুব্ধ অবরুদ্ধ ঘোলাটে-আবর্ত্ত। এই চলন্ত অবরোধের হাত হইতে মুক্তি চাই। চাই বাহির হইবার স্পষ্ট পথ। ইহা ছাড়া আর কি সে করিতে পারে? আছে কোন্ গত্যন্তর?.........

সুনীল যেন এক সমস্যা-ফেনিল উপন্যাসের দ্বিখণ্ডিত নায়ক। অথবা, তার চেয়েও মারাত্মক, সেই উপন্যাসেরই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় লেখক। চিন্তা ভাবনার পাকে পাকে, আবেগের ঢেউএ ঢেউএ, অনেক দূর অগ্রসর হইয়া জানিতে ও অজানিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন এক দুরূহ জটিল ঘটনাবর্ত্তে—যেখানে দৃষ্টি ঝাপসা, কল্পনা আড়ষ্ট, অসহনীয় বিমূঢ়তায়

লেখনী স্তব্ধ। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে প্রয়োজন একটা সমূহ বিপদের। একটা ভয়ঙ্কর রকমের আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটুক, মরুক কেহ; না হয় বাষ্পাকুল নিঃস্বার্থপরতার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সরিয়া পড়ুক যে কেহ একজন, পথ খানিক পরিষ্কার হউক, দুস্তর দ্বন্দ্বের মিলুক একটা কূলকিনারা—অন্ততঃ এক নিরুপায় হাস্যকর যেন-তেন পরিণতি।

আজ সকালে নমিতার চিঠি কি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার মতই সেই গোঁজামিলনের সুযোগ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? আসিয়াছে সুনীলের অক্ষমতার মুখ রক্ষা করিতে? তাহার ভীরুতাকে ঔচিত্যের ছদ্মবেশ পরাইতে? মন্দাকিনীর মতই সুনীল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া হালকা হইতে চায়।

নমিতা চিঠি দিয়াছে ঢাকা হইতে। প্রেমপত্র নয়, তবু ইহারই মধ্যে সুনীল এখানে সেখানে একটু-আধটু মনের উত্তাপ আবিষ্কার করিতে চায়। সুনীলের কাছে—এই উভয়সঙ্কটে—সেইটুকুই যথেষ্ট। এক গ্রহের আকর্ষণের বাহিরে যাইতে হইলে প্রয়োজন হয় আর একটা বৃহত্তর গ্রহের প্রবলতর টান। সে টান যদি নাই বা থাকে, সুনীলের মগজের কারখানায় যুক্তির অভাব নাই, তার কল্পনার দৈন্য নাই, ফাঁকির শূন্য গর্ভ সে ভরিয়া লইবে অনুমানের ঠাসা বাষ্পে। নমিতার চিঠিখানি আসিয়াছে ঠিক সময়টিতে—শুভ মুহূর্তে। আর দুদিন দেরী হইলে ইতিমধ্যে কোথাকার জল যে কোথায় গড়াইত কে জানে। নমিতার চিঠিখানি যেন অথই জলে একটা দুর্ব্বল কলার ভেলা—হোক না হালকা, একটা ভরসা তো মিলিল এতক্ষণে। এই চিঠিকে আশ্রয় করিয়া

সুনীল অণিমার কাছ হইতে বিদায় নিতে পারিবে অনায়াসে, এতটুকুকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া এত বড় করিয়া নিজের কাছেও ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া আনিতে পারিবে অনেকখানি। সুনীল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

নমিতারা কাল ঢাকা মেলে কলিকাতায় ফিরিতেছে। সুনীলও কালই যাইবে। আর একদিনও সে বকুলতলায় থাকিবে না।...

মার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিয়াই সে যাইবে। সে চোরের মত পলাইয়া বাঁচিবে। মায়ের মর্য্যাদাই বজায় থাক্। কিন্তু অণিমা?...

সে-ও বা এমন কি কঠিন ব্যাপার? অণিমার চোখের জলের পরমায়ু তো দু'দিন!—বড় জোর দু' সপ্তাহ, না হয় দু' মাস। আবার হাসি দেখা দিবে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকও মা ভোলে! প্রেমেরও মৃত্যু আছে। তাই না জীবন এত সহজ! ভুলিতেই হয়, না ভুলিলে চলে না।...

যাক্, জননীর ঘুমের আর ব্যাঘাত হইবে না। গ্রামের লোক? তাদেরও দুদিন পরে জিব ব্যথা হইবে—একই কাহিনী লইয়া পরনিন্দা পরচর্চ্চাও আর কাঁহাতক করা যায়! মিটিবে সব সমস্যাই। বজায় রহিল সব দিক। বিংশ শতাব্দীর সুনীল থাকিবে নিশ্চিন্তে—সুদূর মহানগরীতে। অষ্টাদশ শতকের নিরুদ্বিগ্ন মন্থরতা লইয়া বকুলতলা প্রতিদিন জাগিবে, প্রতি রাত্রে ঘুমাইবে—যেমন চলিয়া আসিয়াছে তেমনি চলিবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মাসের পর মাস।...

অণিমা কাঁদিবে? কাঁদুক্। কাল বিকাল পর্য্যন্ত আর কোন কথা ভাবিবে না সুনীল।...

মা মনে মনে হাসিবেন গর্ব্বের হাসি? হাসিলেনই বা। কি এমন

অপরাধ তাঁর? জননীর প্রতিটি আচরণের স্বপক্ষে পুত্র এবার জোরালো যুক্তির উদার পক্ষ বিস্তার করে। পরিবারের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে যাঁর আজীবন কাটিয়াছে, বৃহত্তর বাহিরের উদার আলোকের সঙ্গে যাঁর আশৈশব অসহযোগ, ঘরই যাঁর দুনিয়া, ভাঁড়ার যাঁর ব্রহ্মাণ্ড—সেই স্নেহ-সর্ব্বস্ব নারীর স্পর্দ্ধিত একাধিপত্যের উপর বাহির হইতে আর কেহ উড়িয়া আসিয়া জোর করিয়া জুড়িয়া বসিতে চাহিলে মা হইয়া সে কোন প্রাণে তা সহ্য করিবে! তাঁর কাছে সুনীল এর বেশী আর কি আশা করিতে পারে?...

ঘণ্টাখানেক বাদে মন্দাকিনী সব অভিমান ভুলিয়া ছেলের কাছে আসিয়া সস্নেহে ডাকেন, "খোকা!"

সুনীল মার দিকে ফিরিয়া তাকায় সলজ্জ চোখে।

"কালই যাবি?"

মা নিজ হইতে সাধিয়া কথা বলিতে আসিয়াছেন। শত হইলেও মা! আর কি অভিমান সাজে! খুশী হয় ছেলে।

"হ্যাঁ, কালই যাব।"

"টাকা মেলে?

"হুঁ"

আর কোন প্রশ্ন নাই। মন্দাকিনী চুপ করিয়া থাকেন। চুপ করিয়া ভাবিতে থাকে পুত্রও। সে যে কালই যাইবে, সেই কথাটাই মা যেন আর একবার পাকা করিয়া লইতে চান!

সন্ধ্যা হইয়াছে বহুক্ষণ। আকাশে জ্যোৎস্না, উঠানে জ্যোৎস্না, জলে-জ্যোৎস্নায় একাকার পদ্মার বুক।

বারান্দায়ও বেশ খানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। মাতা-পুত্র নীরবে বসিয়া রহিল বহুক্ষণ। ও-ঘরে নীলু ঠাকুরদার কাছে পড়া ধরা দিতেছে।

ইহার চেয়ে কথা না বলাই যেন ভাল ছিল। কি অসহ্য নীরবতা! এ জীবনে বলিবার মত যেন কিছুই নাই।

আবার সেই একই প্রশ্ন।

"তবে কালই যাচ্ছিস?"

"হুঁ"

"গিয়েই কিন্তু চিঠি দিস্।"

"দেব।"

আবার নির্ব্বাক দুজনেই।......

"বড়দিনের সময় ছুটি থাকবে না তোদের?"

"মাত্র চার দিন ছুটি।"

"তখন বাড়ী আসতে পারবি না?—সঙ্গে দুদিন বেশি ছুটি নিয়ে?"

পুত্র জবাব দেয় না।

"একদিনের জন্য এলেও আসিস কিন্তু।—আমি যে তোকে চোখের আড়াল করে কী করে থাকি সে তো তুই জানিস্ না।"

পুত্র নির্ব্বাক।

মন্দাকিনী কিন্তু পুত্রের নীরবতায় ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া মরিতে-ছেন! ছেলে তাঁর শেষকালে হার মানিয়া সরিয়া পড়িতেছে মায়েরই জন্য! বারান্দার আবছা জ্যোৎস্নালোকে পুত্রের বিরস মুখের দিকে

তাকাইয়া মন্দাকিনী বোঝেন সব—ব্যথায়, করুণায়, কৃতজ্ঞতায় উদ্বেল হইয়া ওঠেন।

"খোকা!"

"কী?"

"কথা বল্।"

পুত্র দূরে গাঙের দিকে চাহিয়া আছে।

"আমি তোকে এবার বড় ব্যথা দিলাম রে—এ ক'দিন তোকে এক মুহূর্ত্তও শান্তিতে থাকতে দিই নি। সে কি আমি আর—" মন্দাকিনী থামিয়া যান। কথাগুলি গুছাইয়া বলিতে পারিতেছেন না। কি বলিতে যেন কি সব বলিতেছেন।

সুনীল তাঁহার মুখের উপর হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফিরাইয়া লয়। মার মনটা তার কাছে এখন আয়নার মতই পরিষ্কার। মাতৃভক্তির প্রতিদানে পুত্রের কাছে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিতে চান। ভাল কথা কিন্তু অতখানি নিশ্চিন্ত মনে কেন? কাঁদুক্ না! অণিমার জন্য কাঁদিতে পারিলে সে দৃশ্য বরং সুনীলের কাছে অনেকখানি সহনীয় হইয়া ওঠে। করুণা সেখানে পথ করিয়া লইতে পারে! এ যে একেবারে নগ্ন রূপ! অসহ্য!

"মা!"

"বল্।"

"আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি।"

মন্দাকিনী উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। বুকটা তাঁর টিপ্-টিপ্ করে।

"অণিমা নয়—তুমি আমায় ভুল বুঝেছ এ ক'দিন!"

ছলনার পালা সুরু করে সুনীল। পরাজয় যদি মানিতেই হইল, মার এই স্পর্দ্ধিত জয়লাভের মধ্যে পুত্রও অশান্তির বীজ ছড়াইয়া দিয়া যাইবে!—

জননীর জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকাইয়া পুত্র অম্লানবদনে বলিয়া যায়, "অণিমা নয়—সে আর একটি মেয়ে, নাম তার নমিতা। কলকাতার মেয়ে, কলেজে পড়ে।"

নমিতা, সুনীতা, অসিতা, বিনীতা—মেয়েটির নাম যাহাই হউক, কিছু আসে যায় না তাহাতে; সে যে অণিমা নয় মন্দাকিনীর কাছে তাহাই যথেষ্ট।

"অণিমা সব জানে—তাকে আমি সব কথা খুলে বলেছি। সেই মেয়েটিকে নিয়েই তো অণিমার সঙ্গে কত কথা কয়েছি এ ক'দিন। আর তাতেই তোমরা দড়িকে সাপ মনে করে আঁতকে উঠেছ।"

মন্দাকিনীর মুখেচোখে চাপা হাসি—বিশ্বাসের না অবিশ্বাসের বলা শক্ত। পুত্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে সেই হাসিটুকু এড়ায় না।

মন্দাকিনী পুরা তিন দিন পরে আজ একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তো।—এবার আমি কোনো কথা শুনব না, সে মেয়েকে ঘরে আমি আনবই।"

মন্দাকিনী মুচকি হাসিতে থাকেন। হাসে ছেলেও—একটা বিদ্রূপের হাসি। এত ভরসা ভাল নয়! কেমন এক অন্ধ উত্তেজনায় পুত্র যেন ফুলিয়া ওঠে মুহূর্ত্ত মধ্যে।

"আমি কালই চলে যাচ্ছি কেন জানো?"

মন্দাকিনী নিরুত্তর। জানেন বৈ কি।

"আপিস খুলবার তিন দিন আগেই কলকাতা গিয়ে বসে থাকব এখন কিসের জন্য শুনবে ?"

এত কথার পরেও মন্দাকিনী কান খাড়া করিয়া থাকেন।

"সে মেয়েটি কাল ঢাকা মেলে কলকাতা যাচ্ছে, তাই। নইলে ছুটি না ফুরোতেই আগে ভাগে কলকাতা গিয়ে বসে থাকার কী এমন দায় পড়েছিল।"

মন্দাকিনীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া ওঠে। তাঁর অনুমানের তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছে বহুক্ষণ। পুত্র যে কাল চলিয়া যাইতেছে তার কারণ তবে মা নয়?...

"আজ সকালে নমিতার চিঠি পেয়েছি। কাল তাদের সঙ্গে এক ষ্টীমারে কলকাতা যেতে অনুরোধ জানিয়েছে—"

মন্দাকিনী পাংশুমুখে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে ছেলের মুখের দিকে।

"এই ছাখো নমিতার চিঠি," বুক পকেট থেকে রঙীন খামটা সুনীত মার কাছে মেঝের উপর রাখিয়া দেয়, "পড়ে দেখতে পারো।

বার

পরদিন সারা সকাল মন্দাকিনীর এতটুকু ফুরসৎ নাই। ছেলের বাক্স সাজাইয়াছেন, বিছানাপত্তর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। লুচি, হালুয়া আর পাতক্ষীর দিয়াছেন টিফিন-ক্যারিয়ারে—পথের খাবার; আর কলিকাতা গিয়া দু'দশ দিন রাখিয়া খাইবার জন্য বাক্সের মধ্যে দিয়াছেন আমসত্ত্ব, চালতেপিঠা, তিন-চার রকমের নারিকেলের খাবার, মুড়ির-হাঁড়িতে-রাখা শীতকালের নতুন খেজুর-গুড়—এমন অনেক কিছু।

বেলা যত বাড়ে, মন্দাকিনীর বুকের মধ্যে কেবলি হু হু করিতে থাকে। আর ঘণ্টা চারেক—তার পর পুত্র আর এখানে নয়। আবার দেখা হইবে এক বৎসর পরে—বড়দিনের ছুটিতে যে আসিবে তাহার ভরসা কি! শেষকালে বাড়ী হইতে ছেলেকে তিনি তাড়াইয়া দিলেন? মন্দাকিনী কতাগুলি ভাবেন, আর মাঝে মাঝে আড়ালে গিয়া খানিক নিঃশব্দে কাঁদিয়া লন—পরক্ষণেই এক হাতে চোখ মোছেন, আর এক হাতে কাজ সারিতে থাকেন।...

পুত্র কাল রাত্রে যে-কথাটা বলিয়াছে, সে কি তবে সত্য? মিথ্যা হইবার তো কথা নয়। চিঠি পর্য্যন্ত দেখাইয়াছে—মাকে পড়িয়া দেখিতেও দিয়াছিল।

প্রথমটায় মন্দাকিনী কিন্তু কথাটায় তেমন গুরুত্ব দেন নাই। এই কয়দিনের অভিযোগ ও অভিমানের সঘন বাষ্পবেদনার মধ্যে সহসা আর একটা নূতন উৎপাত পথ করিয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু কাল সারা রাত আর আজ বেলা এগারটার মধ্যে—এই ঘণ্টা পনের যাইতে না যাইতেই অণিমা ধীরে ধীরে আড়ালে সরিয়া পড়িতেছে এবং একটি অপরিচিত যুবতি মেয়ের একখানি কল্পিত মুখ মন্দাকিনীর সারা শঙ্কিত মন জুড়িয়া বসিতে চায়।...

আর ঘণ্টা পাঁচেক!...

তারপর ছেলে তাঁর সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে—তাঁর নাগালের বাহিরে—সুদূর কলিকাতায়। ছেলের যাত্রার সময় যতই আগাইয়া আসে, মন্দাকিনী ততই অজানা শঙ্কায় উতলা হইতে থাকেন। কাছে থাকিয়া যাহাকে লইয়া এই সাতটা দিন এত দুর্ভোগ ভুগিতে হইল, সেই ছেলের কলিকাতার দিনগুলি কল্পনা করিতেও মন্দাকিনীর বুক দুরদুর করে। শত হউক তবু তো ছেলে কাছেই। অণিমাও তো বকুলতলারই মেয়ে। এ যে শত-শত যোজন দূরের, সব বাধানিষেধের বাহিরের, অজানা অদেখা অপরিচিতা, একটি সহুরে মেয়ে।

মন্দাকিনী নিঃশব্দে কাঁদেন। রাগে না দুঃখে, ভয়ে না অভিমানে—কে জানে। এই এক সপ্তাহ অণিমার সঙ্গে যুঝিতে গিয়া শঙ্কায় কাঁপিয়াছেন, অভিমানে ফুলিয়াছেন, রাগে দুঃখে ফাটিয়া পড়িয়াছেন—

করিয়াছেন এমন অনেক কাণ্ড! কিন্তু কলিকাতায় তো মন্দাকিনী নাই! মন্দাকিনীর যত শক্তি, যত উপায়, যত কৌশল শুধু এখানেই—এই বকুলতলায়—এই অণিমার বেলায়!

মন্দাকিনীর বুকের মধ্যে তোলপাড় সুরু হয়। চোখ বুজিয়া ভগবানের কাছে বার বার ব্যাকুল প্রার্থনা জানান।...ছেলের সুমতি হউক্। নিশ্চয় তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে। নহিলে অমন নির্লজ্জের মত নিজের মায়ের কাছে কেউ কখনো বলিতে পারে—"আমি মেয়েটিকে ভালোবাসি। তার সঙ্গে এক স্টীমারে কলকাতা যাচ্ছি।"... নিশ্চয় তাহার চরিত্র নষ্ট হইয়াছে। মিথ্যা বলিতে মুখে আটকায় না। পাপপুণ্যের বাছবিচার নাই! অণিমার সঙ্গে এ কয়দিনের ব্যাপারটা তো প্রায় তাঁর চোখের উপর দিয়াই ঘটিয়া গেল। আর কত?...কাল তাঁরই চোখের উপর অণিমা অমন শক্ত করিয়া তাঁরই ছেলের কোঁচার খুঁট ধরিয়া রাখিল বেহায়ার মত, তার পরেও ছেলের কথাকে তিনি বিশ্বাস করিবেন নাকি! কলিকাতায় না জানি সে আরো কত অনাসৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। কত নমিতা আছে তাহার ঠিক কি! কি নোংরা প্রবৃত্তি! পুত্র তাহার পাপের পথে পা বাড়াইয়াছে। শঙ্কিত জননী ভগবানের কাছে ছেলের সুমতি কামনা করেন বার বার।...পুত্রের মনের এই কুশ্রী ব্যাধি দূর হক্, সুস্থ হক্, স্বাভাবিক হক্ সে, মানুষের মত মানুষ হক—তাঁহার বাপ-ঠাকুরদার নাম যেন ডোবায় না শেষকালে! হে ভগবান!...

সুনীলের সারা সকাল কাটিয়াছে এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এপাড়া ওপাড়া—সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সারিতে। যায় নাই শুধু অণিমাদের

বাড়ীতেই। অণিমার চোখের জলকেই সে ভয় করে এখন। কাঁদিবে অণিমা, ভীষণ কাঁদিবে। এ-কান্না আগের ও-সব সস্তা চোখের জল নয়। এ ক্রন্দন অপমানের, চূড়ান্ত পরিহাসের!

ঠাকুরদার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সাংসারিক কথাবার্তা শেষ করিয়াছে। সুনীল যেন আসামী, আর ব্রজনাথ বিচারক—এমনি ভারাক্রান্ত ব্যবধান উভয় পক্ষে। নীলুকে কাছে ডাকিয়া আদর করিতে গিয়া নিজেও লজ্জিত হইয়াছে বড় কম নয়। বোনের মুখে-চোখে কেমন এক সংশয়ের ভাব, তার দাদা যেন আর সে দাদা নাই—আর তেমন আপন নয় যেন। এমন কি, বাবলুও আগের মত গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদার জানায় না আর। ডাকিলে কাছে আসে—না আসিলে নয় এমনি ভাব।

অন্যায় কি! সে যে আজ সত্যই অপরিচিত—অপরিচিত ছোট ভাইয়ের কাছে, বোনের কাছে, নিজের মায়ের কাছে। অপরিচিত সে অণিমার কাছেও। নহিলে মেয়েটা তাহাকে অতখানি বিশ্বাস করিয়া এমন ভুলও করে! বাদলদা কি চিরকাল একই বাদলদা থাকিবে নাকি? আজ যে তার অনেক বয়স, অথই মন!...

বকুলতলা সত্যই তাহাকে ভাল করিয়া চিনে না আর। তার একটা দিক তার সব চেয়ে বড় দিকটাই আজ একেবারে অজ্ঞাত, তার পরিণত মনের অপরিমেয় রূপটা যে এখানে অবজ্ঞাত! নিজের সংসারে আপন জনের কাছেও সে আজ অনেকখানি পর—বৎসরান্তে দিন কয়েকের এক বিদেশী অতিথি যেন।...

সে আজ বকুলতলার কতখানি? তার মধ্যে বকুলতলাই বা

কতটুকু? বার মাস থাকে সে বিদেশে। তিন শ পয়ষট্টি দিনের তিন শ পঞ্চান্ন দিনই কাটে তার কলিকাতায়—মহানগরীতে কাটে তার সকাল সন্ধ্যা, বর্ষা, বসন্ত, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্ত্ত—সমগ্র অস্তিত্ব! জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ কলিকাতা শুধু তার কর্ম্মস্থলই নয়, জীবনের লীলাস্থল। মৃত্যুর পরেও তাহাকে দাহ করিতে পদ্মাপারে লইয়া আসিবে না কেহ—নিবে নিমতলায়, না হয় কেওড়াতলায়। কলিকাতাই তাহার দেশ, বকুলতলা বিদেশ—এখানে দুদিন বেঁড়াইতে আসে, বেড়াইয়া যায়, ভালই লাগে, একটু বৈচিত্র্য হয়, ব্যস্! ভাববিলাসের আশ্রয় না নিলে, এই তো সম্বন্ধ তাহার বকুলতলার সঙ্গে—মন্দাকিনীর সঙ্গে, অণিমার সঙ্গে, সকলের সঙ্গে!···

তবু নাকি বকুলতলাকে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে—সরল বিশ্বাসে মানিতে হইবে তার সহস্র ঋণ, তার অসংখ্য দাবী। তাও কি সম্ভব!

বসিয়া বসিয়া ভাবে সুনীল। যুক্তির পর যুক্তি আসে. আবেগের পর আবেগ। কুযুক্তি? হয় তো তা-ই, হয় তো নয়। শুধুই বাষ্প? ক্ষতি নাই। এখন সে গোটা দুনিয়াকে ঢালিয়া সাজিতে পারে। আজকের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজটা এখনো বাকি। অণিমার কাছে আর খানিক বাদেই বিদায় লইতে হইবে। দেখিতে হইবে আর এক পালা ক্রন্দন। তারই জন্য প্রস্তুত হইতেছে সুনীল! মনে মনে শানাইতে থাকে অস্ত্র—খাড়া করে ঔচিত্যের পাহাড়, দাঁড় করায় পর্ব্বতপ্রমাণ সমর্থন! নমিতা হক, যে-কেহ হক—অণিমা নয়। তার মনের সঙ্গে বকুলতলা তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না, হোঁচট

খাইবে পদে পদে—অনৈক্য আর অনর্থের বোঝায় জীবন হইবে ভারাক্রান্ত—আড়ষ্ট, অসাড়, পঙ্গু!...

ডাক দিয়াছে নমিতা। তার চিঠির মধ্য দিয়া ডাক দিয়াছে মহানগরী—তার জীবনের, যৌবনের ডাক। কলিকাতা! প্রতি ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলেই যেখানে তার মুঠার মধ্যে গোটা দুনিয়া। মস্কো থেকে মান্দালয় আর হংকং থেকে হনোলুলু উর্দ্ধশ্বাসে ঘুরিয়া আসে আধ ঘণ্টায়।—ইতালীর হুমকি, জার্ম্মানীর হালচাল, রাশিয়ার শক্তিসঞ্চয়, গোল টেবিলের তোড়জোড়, গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার, বোম্বাই পুলিশের নির্ব্বিচার লাঠিচালনা, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শুনানী, চুরি ডাকাতি, ব্যাভিচার, নারীহরণ, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারী, মহোৎসব—এক নিঃশ্বাসে স্পন্দিত হয় সত্ত বর্ত্তমান! বেগ আর বেগ, গতি আর গতি! জীবনের সঙ্গেই যার ছন্দ, যৌবনেরই সঙ্গে যার যতি! শতলক্ষ ঘটনার উপলখণ্ডে উচ্ছলিত হইয়া চলে সুবিপুল কর্ম্ম-প্রবাহ কিন্তু...

সেই মহানগরীর সঙ্গেও সে পুরাপুরি মিলিতে পারিল কৈ! আবার বকুলতলার মনের সঙ্গেও জলের উপর তেলের মত ভাসিয়া থাকে—মিশ খায় না। তার প্রবহমান মনের এপারের তীরই শুধু ভাঙ্গিয়াছে—ভাঙ্গিতেছে। ওপারে আজো চর জাগে নাই। এই দুধারার দ্বন্দ্ব অসহ্য, এই দোটানার দোলন প্রাণান্ত। তাই সে কলিকাতায় বেখাপ, বকুলতলায়ও বেমানান। সে যেন ভাঙ্গা আর গড়ার মাঝখানের প্রাণান্ত 'ইতিমধ্য'। দুদিকের টান মানিয়া নিজের মধ্যে নিজেকে শুধুই গুটাইয়া রাখিতে চায় নিশ্চল ভারসাম্যের নিষ্ফল দুরাশায়।

সে প্রজাপতি নয়, শুঁয়ো পোকা—তেমনি অদ্ভুত উৎভট উৎকট তার মনের খেলা :…

এই সাতটা দিন সে যেন ফিরিয়া আসিয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। আজ আবার বিংশ শতাব্দী ডাক দিয়াছে তার কর্ম্মক্ষেত্রে; উঃ! এই সাত দিন সে খবরের কাগজ পড়ে নাই! এমন করিয়া দু দিনও চলিবে না—চলিতে পারে না। এই চলন্ত মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিবে অণিমা? তা-ও কি সম্ভব? যদি সম্ভবও হয়, অণিমার সেই সাহস কোথায়? সুনীল তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে প্রস্তুত। সেখানে থাকিয়া লেখাপড়া করিবে, মানুষ হইবে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার পথ মিলিবে, সুনীলকে বাদ দিয়াও নিজের জীবন—যেমন খুশি, যেখানে খুশি—গড়িয়া তুলিতে পারিবে। সুনীল তো তাহাকে মুক্তি দিতেই চায়। কিন্তু অণিমার যে পায়ে শিকল! শিকল ছিঁড়িবে? সেই শিক্ষা বা সেই সাহস তার কোথায়?…

“বাদলদা।”

সুনীল চমক ভাঙ্গিয়া চাহিয়া দেখে, অণিমার ছোট ভাইটি আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে। হাতে একখানি ছোট চিঠি—ভাঁজ করা।

“বাদলদা, মা আপনায় একবার যেতে বলেছে,” বলিয়াই চিঠি দিয়া ছেলেটা চোরের মত চলিয়া যায়।

চিঠি দিয়াছে অণিমা :

বাদলদা, শুনিলাম আজই আপনি চলিয়া যাইতেছেন। যাইবার আগে অবশ্য অবশ্য একবার দেখা করিবেন।

অণিমা

সুনীলের সারা শরীরের রক্ত আবার নাচিয়া ওঠে। অনিমা ডাকিয়াছে। অনিমার হাতের লেখা। অনিমার অনুরোধ।—এখনই যাইবে সে'।

অনিমাদের ঘরে ঢুকিয়াই সুনীলের চক্ষু স্থির। এ কি কাণ্ড! অনিমা একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে তাহার জামা-কাপড় পুঁথিপত্র সব গুছাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে।

"বাদলদা, আপনার সঙ্গে আমিও আজ ক'লকাতা যাচ্ছি।"

"সে কি!"

"আপনিই তো কাল নিয়ে যাবেন বলেছেন। আমি মেয়েদের বোর্ডিং-এ থেকে পড়ব।"

কোথায় সেই রোরুদ্যমানা অসহায়া অনিমা। স্থির সহজ দৃষ্টি—দৃঢ় সঙ্কল্পের স্পষ্ট ছাপ মুখেচোখে। প্রশ্ন করে, "কী ভাবছেন?"

"তা—হ্যাঁ—তবে, আগে থেকে—"

"আমার পড়ার খরচ চালাতে না আপনি রাজি হয়েছেন! আমি চাকরি করে একদিন আপনার সব টাকা শোধ করে দেব বাদলদা।—ধুবড়ী ছেড়ে চলে না এলে এদ্দিন আমারো একটা পথ হত— আমাদের বিজয়াদি তো আমায় রেখে দিতেই চেয়েছিলেন, বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না। আমার সর্ব্বনাশ করতে ওরা বাকি রাখেনি কিছু।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া গিয়া অনিমা গড়-গড় করিয়া বলিয়া যায়, "কাল রাত্তিরে মার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে আমায় কিছুতেই যেতে দেবে না। তাতে নাকি জাত যাবে। নিন্দায় পৃথিবী রসাতলে যাবে। আমি কিন্তু যাবই। এখন আমার একটা পথ

করে দিন, বাদলদা। আপনার দেনা আমি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দেব, শপথ করছি।"

সুনীল হতবাক্। অণিমা এ-সব বলে কি! কাল ঝোঁকের মাথায় একটা কথার কথা বলিয়াছে মাত্র। অণিমা তারই উপর ভরসা করিয়া বাক্সবিছানা সাজাইয়া একেবারে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত! পাগল নাকি!

"কথা বলুন"

"কিন্তু...অণিমা—"

"কিন্তু টিন্তু শুনব না। আমি যাবই। এখানে থাকলে ওরা আমাকে ধরে বেঁধে যার-তার হাতে গছিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। তার আগে আমার পথ আমি নিজেই খুঁজে নেব। আপনিই তো কাল বলেছেন, অণিমা তোর সাহস আছে?—পারবি যেতে? সাহস আমার আছে বাদলদা।"

"ন-কাকা আর কাকীমার অমতে কী করে তোকে নিয়ে যাব?"

"আমি তো আর কচি খুকী নই।"

"কিন্তু এর মধ্যে অনেক কিছু ভাববার আছে অণিমা।"

"কিসের ভাবনা?"

"অনেক কিছু।"

"সমাজ?"

"না, সমাজের আইনের চেয়েও বড় আইন আছে অণিমা। ন-কাকা ইচ্ছে করলেই আমায় বিপদে ফেলতে পারেন।"

"কিসের বিপদ? আমি তো খুকিটি নেই আর—আমায় ভাঁড়াবেন না বাদলদা। আপনারই নিয়ে যেতে সাহস নেই বলুন।"

"হঠাৎ—আগেভাগে ব্যবস্থা না করে—তোকে...কলকাতায় কোথায় নিয়ে তুলব? মেসে তো আর মেয়েছেলে নিয়ে ওঠা যায় না।"

"দু দিন নমিতাদের বাড়ীও থাকা যাবে না?"

"দূর থেকে কলকাতা সহরটাকে যে কী ভাবিস্ তোরা। সেখানে আতিথ্য মেলে না অনু। আমি আগে কলকাতা যাই, গিয়ে সব ব্যবস্থা করি, তখন তুই রওয়ানা হবি—আমি চিঠি দেব।"

"আপনি কোন চিঠি দেবেন না তা বেশ জানি।"

"এ অবিশ্বাস কেন তোর?"

"আপনার কোনো কথায় আর আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এ ক'দিন তো কেবল মিথ্যার ওপর দিয়েই চলে এসেছেন। আজ একটু সত্যি কথা বলুন। আপনার সাহস আছে আমার ভার নেবার? পারবেন?"

"কলকাতা গিয়ে কার ভরসায় থাকবি জিগ্‌গেস করি?"

"আপনার।"—অকপট জবাব।

"তাহ'লে আমায় এত অবিশ্বাস করে লাভ কী শুনি? মিথ্যাই যদি ব্যবসা আমার, তোকে আমি তো সর্ব্বনাশের পথেও টেনে নিয়ে যেতে পারি—আমার সঙ্গে যেতে চাস্ তবে কোন্ সাহসে?"

অনিমা এবার চুপ করিয়া যায়। খানিক বাদে করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "পরে আমি কার সঙ্গে যাব? কে আমায় দিয়ে আসবে?—কার অত দায় পড়েছে?"

এবার সুনীল চুপ করিয়া থাকে।

অণিমা তাহার ছলনা ধরিয়া ফেলিয়াছে। বুঝিতে পারিয়াছে, অণিমাকে লইয়া যাইবার ক্ষমতা তাহার নাই—অথবা সেই ইচ্ছা তাহার নাই। তবে তাহাকে লইয়া এই ক'দিন এমন মাছ খেলাইবার কি প্রয়োজন ছিল?

"বলুন বাদলদা, আপনারই সাহস নেই। মুখে অনেক বড় বড় কথাই বলতে পারেন।"

"অনু, তুই সব কথা ভালো করে ভেবে দেখিস্ নি। তোর মাথা এখন ঠিক নেই।"

"কাল তবে অত করে বললেন কেন?" অণিমা হতাশ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকে সুনীলের মুখের দিকে! এ যেন সেই বাদলদা নয়—প্রথম দিনের সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ সহাস্য বাদলদা আর নাই!—ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ!

"অনু, আমার সঙ্গে কলকাতা যাবার অর্থ বুঝিস্?"

"বুঝি!"—স্পষ্ট উত্তর।

"বাপ-মার অমতে একাজের পরিণাম কী হবে তা জানিস?"

"জানি"—দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

"তোর বাবা-মা এগাঁয়ে আর টিকতে পারবে না তা ভেবে দেখেছিস?"

"দেখেছি। গাঁয়ের এ-সব শেয়াল-কুকুরের চীৎকার আমি গ্রাহ্য করি না।"

সুনীলের কালকের উক্তিটাই অণিমা আজ পাল্টা জবাবে ফিরাইয়া দেয়।

"তুই এত বড় স্বার্থপর অনু?—বাবা, মা, ভাই, বোন এদের কী গতি হবে সে সব ভাবনার মধ্যেই ধরছিস্ না। লোকনিন্দায় তাদের যে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। যাবে কোথায় তারা? গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা ন'কাকীর ইস্কুলে আর পড়তে আসবে ভেবেছিস? খাবে কী এরা?"

"লোকনিন্দার আরো বাকি আছে ভেবেছেন!—সারা গাঁয়ে আমাদের নিয়ে কী যে সব রটনা হচ্চে তা যদি শুন্‌তেন"—এতক্ষণের তেজস্বিনী অণিমা এবার কাঁদিয়া ফেলে। নিরুপায় সুনীল বোকার মত চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে শুধু।

"আপনাদের পয়সা আছে, লোকে মুখের উপর বলতে ভয় পায়।" অণিমা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে, "আমাদের গরীব পেয়ে তারা অপমান করতে ছাড়বে কেন?"

সুনীলকে এই মহা বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন সুলতা। পুকুর ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

অণিমাদের বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সুনীল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। মেয়েটা সত্যই পাগল!...

সত্যই. সুনীলের শক্তি নাই, সাহস নাই—সাহস নাই গ্রামের পাঁচ জনকে অস্বীকার করিবার, সাহস নাই মন্দাকিনীর চোখের জল অগ্রাহ্য করিবার। অণিমার পায়ে শিকল, সুনীলের শিকল মনে!

সত্যই সে ভীরু। অস্পষ্ট বলিয়াই কপট, দুর্ব্বোধ বলিয়াই অক্ষম। তার এতদিনের অহঙ্কৃত আত্মপরিচয়ের তলে যে এতবড় ফাঁক ছিল তাহা টের পাইল সে আজ।

বাড়ীর উঠানে পা দিতেই মার গলার আওয়াজ পাইয়া সুনীল যেন মস্ত বড় একটা আশ্রয় পাইয়া গেল। সেই কণ্ঠস্বর! সেই মা! এক মুহূর্ত্তে মনে পড়িয়া যায় বাল্যের আর কৈশোরের খণ্ড, অখণ্ড, অসংখ্য কাহিনী—মার আদর, মার উৎকণ্ঠা, মার সহস্র স্নেহের শাসন। সব চেয়ে বেশী করিয়া কি জানি কেন সহসা এখন মনে পড়িয়া গেল—বহুকাল আগের একটা তুচ্ছতম ঘটনা। বাবার কাছ হইতে তাড়া খাইয়া ভয়ে ভয়ে ছয়-সাত বছরের খোকা গিয়া মার নিশ্চিন্ত কোলে আশ্রয় নিয়াছে—সেই সিঁদুর-পরা সিঁথির উপর আঁচলের চওড়া পাড়, এক দোহারা দেহকাণ্ড, শ্যামল সুন্দর একখানি মুখ, সহাস্য সলজ্জ একজোড়া চোখ! মনের পটে এক নিমেষে জাগিয়া মিলাইয়া যায় সেই ঝাপসা ছবিখানি! মনে পড়ে পিতার চোখ রাঙানো, আর জননীর পুত্রপক্ষ সমর্থন। সেই মার জন্য সুনীল প্রয়োজন হইলে অনেক কিছুই ত্যাগ করিতে পারে। অণিমা তো অণিমা! যেন—সুনীল নিজেকে এখন বারবার বুঝাইতে চায়—সেই মার জন্যই সে এতখানি সহ্য করিয়া গেল!

"খোকা এসেছিস?"

"হ্যাঁ মা! ডাকছো আমায়?"

"নাইতে যা এবার," বলিতে বলিতে মন্দাকিনী ঘরের বাহির হইয়া পুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। সুনীলের কল্পনার রাঙা বেলুনটা ফাটিয়া যায় এক মুহূর্ত্তে। মার দিকে খানিক নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া চোখ ফিরাইয়া নেয়। কোথায় সেই স্নেহসর্ব্বস্ব বধূ মা! সুনীলের সম্মুখে এখন দাঁড়াইয়া আছে অভিমানী, রাশভারী এক প্রৌঢ়া বিধবা—যাঁর

দুর্দ্দমনীয় জেদের মুখে পুত্রের দৃঢ়সঙ্কল্প সব খসিয়াভাসিয়া গেল! তবুও তাঁর মনস্কামনাই পূর্ণ হউক।

"মা, তোমার আর আমার সেই ফোটোখানা কোথায় গো?"

"কোন্ ফোটো?"

"সেই যে আমার ছোটবেলায় তোমার সঙ্গে তোলা।"

"বাক্সে রেখে দিয়েছি—নষ্ট হয়ে গেছে, ভালো বোঝা যায় না আর।

"আমার সঙ্গে দিয়ে দাও—কলকাতায় ওর থেকে নতুন করে একটা ফোটো করিয়ে নেব'খন।—এখনো সময় আছে, পরে একবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ফোটোটা কাগজে জড়িয়ে আমার বাক্সের মধ্যে মনে করে রেখো কিন্তু।"

তের

মন্দাকিনী, মানদা, নীলু আর বাবলু আসিয়া নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়াছে জাহাজের অপেক্ষায়। আর খানিক বাদে ঢাকা-মেল যাত্রী লইয়া চলিয়া যাইবে সুদূর গোয়ালন্দে—কলিকাতায়!

বাঁদিকে গ্রামের শেষে মাঠের ওপারে ঐ বৃক্ষশ্রেণীর ওপিঠেই তারপাশা স্টেশন। ঘণ্টাখানেক হয় সুনীল বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে—সঙ্গে গিয়াছেন ব্রজনাজ আর নন্দ দাস। বহুদূরে গাছপালার মাথায় রাশি রাশি ধোঁয়া উঠিতেছে উর্দ্ধ আকাশে—ষ্টীমার এখনো তারাপাশা স্টেশন ছাড়ে নাই।

নিকারীপাড়ার গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জাহাজ দেখিবে বলিয়া। মন্দাকিনীদের কুকুরটাও আসিয়া দলে ভিড়িয়াছে—একটা জাম গাছের তলায় শুইয়া সে লেজ নাড়ে ঘন ঘন।

বর্ষা বিদায় নিয়াছে। পদ্মার আর সেই রুদ্র রূপ নাই। শীতল পাটির মত নিস্তরঙ্গ নদী—যেন একটা প্রবল উত্তেজনার পর প্রতিক্রিয়ার ক্লান্তি-সুখ উপভোগ করিতেছে। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়াছে বহুক্ষণ।

গ্রামের মধ্যে এখন অপরাহ্ণের ম্লানাভ ছায়া ; গাঙের পাড়ে এখনো কিছু ডগ্‌ডগে রোদ।

মন্দাকিনী আঁচলে চোখ মোছেন, ঘন ঘন তাকান নদীপথ—দূরের বাঁকটার দিকে। পুত্র চোখের অন্তরাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে তাঁর এখন সারা দুনিয়ার ভয়-ভাবনা...এ-কয়দিন তবু তো সে চোখের সামনেই ছিল। আজ—এই এতক্ষণে, এই বিচ্ছেদ-বেদনার মাঝখানে, মন্দাকিনী এতকালের অস্পষ্ট সত্যটাই স্পষ্ট করিয়া বুঝিলেন : ছেলে তাঁহার সত্য-সত্যই পর হইয়াছে! আর সে 'খোকা' নাই। আর তাহাকে নাগালের মধ্যে পাইতে চাওয়া নিষ্ফল প্রয়াস। সে এখন বাহিরের, সে দূরের, সে সবার—সে বকুলতলার অতি-আপন হইয়াও আর বকুলতলার নয়।

তবু এই রূঢ় কথাটা তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে চান না যে! কেন ছেলে দূরের হইবে? কোথায় যাইবে সে?...মন্দাকিনী তাহাকে এখনো ধরিয়া রাখিতে পারেন। নিশ্চয়ই পারেন! বকুলতলার ছেলেকে বকুলতলায়ই বাঁধিতে পারেন।—অন্ততঃ পারিতেন। এ ক'দিন ভুল করিয়া আসিয়াছেন আগাগোড়া।...আর মা নয়। অণিমা পারে—অণিমাই পারিত। ভুল—মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিয়াছেন।...

দূরে স্টীমারের বংশীধ্বনি শোনা যায়—এই বুঝি তারপাশা স্টেশন ছাড়িয়া গেল। গাছের মাথায় অজস্র মেঘাক্লিষ্ট ধোঁয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া আসিতেছে সামনের দিকে।

কখন সবার অলক্ষ্যে অণিমা আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছে একটা গাছের আড়ালে।

মানদা ফিশফিশ করিয়া কহিল, "বৌমাদিদি! ঐ ছাখো, এসে দাঁড়িয়েছে।"

"কে?"

"কে আর কে!—ঐ যে বকুল গাছটার ওপাশেই।"

"কে অনু?" মন্দাকিনী উচ্চ কণ্ঠে ডাক দেন।

চোখাচোখি হইতেই অণিমা মুখ ফিরাইয়া নেয়। মন্দাকিনী কিন্তু আগাইয়া যান, "অনু, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?—আয় না এখানে।"

খানিক ইতস্তত করিয়া অণিমা কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। মন্দাকিনী যেন এক প্রবীণা সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া একবার তাহাকে আপাদ-শির দেখিয়া লইলেন। মেয়েটা সত্যই অভাগী! ওর কপালই মন্দ। এই ভরা বয়স আর এই ভরা যৌবন লইয়াও একটা পুরুষের মনকে জয় করিতে পারিল না সে! তাঁর ছেলে কি এতই কঠিন, এতই বিরাট?...

"অনু"

অণিমা মাথা হেঁট করিয়াই আছে।

"অনু, নমিতা কে রে?"

অণিমা বিস্মিত হইয়া মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকায়।

"বল না মা, আমায় আর লুকোস্ নে। তুই তো সবই জানিস্!"

—বড়মাও জানেন তবে!...

"কথা বল না অনু!"

"কী?"

"নমিতাকে খোকা বুঝি বিয়ে করতে চায়?"

"তার মনের কথা আমি কী করে জানব?"

"মেয়েটির স্বভাবচরিত্তির কেমন রে?"

"আমি তার কী জানি বড়মা!"

"তবু—তুই তো শুনেছিস্ সব।" অসহিষ্ণু মন্দাকিনী প্রশ্ন করতে থাকেন, "নমিতা দেখতে কেমন?"

"আমি তো তাকে দেখি নি।"

"শুনেছিস তো?"

"শুনেছি, দেখতে সে কালো।"

অ্যাঃ! তাই ছেলে কালো মেয়ে বিয়ে করতে চায়! তাই সে বলে কি না মা আমার কালো, আমিও কালো মেয়েই বিয়ে করবো! এ্যা! ... সদ্য বিচ্ছেদ-ব্যথার মধ্যেও মন্দাকিনী কোথায় যেন গর্ব অনুভব করেন অপরিসীম। "তা···দেশে আর কালো মেয়ে মেলে না রে অনু, শহুরে মেমসাহেব নিয়ে আসতে হবে?"

এ কথার জবাব দিয়ে কি অণিমা? পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে নিঃশব্দে সে মাটি খুঁটিতে থাকে।

এদিকে বিস্মিত মানদা হা করিয়া চাহিয়া আছে। আসলে মাথা খারাপ এই ঠাকরুণেরই। এত সব কাণ্ডের পরেও আজ হঠাৎ এ কেমন ধারা মাথামাথি!

ষ্টিমার ষ্টেশন ছাড়িয়া রওয়ানা হইয়াছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলি ক্রমে ক্রমে আগাইয়া আসিতেছে মাঠের শেষের দিগন্তরেখা ধরিয়া—আর একটু আসিলেই ঝাউগঞ্জের বাঁকটা ঘুরিয়া জাহাজ বকুলতলায় একটানা দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িবে।···

মোড়ের মুখে এবার ষ্টীমার দেখা গেল। অজস্র ধোঁয়া ছাড়িয়া

পাড় ঘেঁসিয়া আসিতেছে। এই এক মাইল নদীপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে বড় জোর আয় দশ বার মিনিট। দূর হইতে মন্দাকিনী ছেলেকে একবার শুধু চোখের দেখা দেখিয়া লইবেন—হয় তো দেখিতে পাইবেন সেই মেয়েটিকেও। বিচিত্র কি! হয় তো দেখিবেন তাঁর ছেলের পাশেই নমিতাও দাঁড়াইয়া আছে। যে দুঃসাহসী ছেলে তাঁর! মন্দাকিনীর বুকটা ধড়াশ ধড়াশ করিতে থাকে।

অনু!"

অণিমা সাড়া দেয় না।

অনু, আমার ওপর রাগ করিস নে মা—আজকাল আমার বুঝি মাথার ঠিক আছে! কী বলতে কী সব বলি।"

অণিমা অবাক হইয়া উৎকর্ণ হইয়া থাকে শুধু কথা বলে না। এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণটা তলাইয়া বুঝিতে চায়

"অনু, ছেলে বড় হলে পর হয়ে যায়, না রে?"

"এ সব কী বলছ বড়মা?"

"নমিতা কি আমায় মানবে কখনো—তোদের মতো শহরের লেখাপড়া জানা মেয়ে, সে বুঝি এক রাত্তির এ গাঁয়ে এসে বাস করবে ভেবেছিস?"

অণিমা ঔৎসুক্য আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করে, "বড়মা, নমিতার কথা বাদলদা সব বলেছে তোমায়?"

"তার চিঠিও দেখিয়েছে"

"চিঠি!"

হ্যাঁ-রে। চার পাঁচ পৃষ্ঠায় এক লম্বা চিঠি দিয়েছে খোকার কাছে। ছেলে আমায় আবার তা পড়তে দিয়েছিল কাল।"

পড়েছ ?" প্রশ্ন করে অনিমা।

"আমি বুঝি ও চিঠি পড়ে বুঝতে পারি সব।—আর আজকাল ভালো করে দেখতেও পাই না চোখে। তুই আমায় পড়ে শোনাস তো মা।"

"সে চিঠি তোমার কাছেই আছে ?"

মন্দাকিনী চুপ করিয়া যান। ছেলের সুটকেশ হইতে জামা-কাপড় ভাঁজ করিয়া রাখিবার ছলে, আজ চিঠিখানি তিনি চুরি করিয়া রাখিয়াছেন।

"অনু, তোর ছেলে বড় হলে তাকে বেশি লেখাপড়া শেখাস্ নে মা।"

অনিমা শুধু চুপ করিয়া শুনিয়া যায়।

"—লেখাপড়া শিখেও যদি," মন্দাকিনী একটু ঢোক গিলিয়া বলিয়া গেলেন, "তার চেয়ে মুখ্যু হয়ে থাকাও ভালো রে !"

বড়মার উপর এখন অনুকম্পাই হয় অনিমার।

নীলু হাঁ করিয়া গিলিয়া চলিয়াছে মার প্রতিটি বাক্য। কেবল বাবলু বলে, অনুদি, দাদা যেই হাত দেখাবে, পাড় থেকে আমি অমনি রোমাল দেখাব !"

"হুঁ"

দিদি আঁচল ওড়াবে বলেছে। তুমিও আঁচল উড়িয়ে দেখাবে অনুদি ! কেমন ?"

"না।"

"কেন ?"

ষ্টীমার অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে। সামনে খানকয়েক

জেলে-নৌকা পাইয়া বাঁশী ফুঁকিয়া ধমক দিল বারকয়েক। এ তো আর যা-তা ব্যাপার নয়। কলিকাতার ডাক আর যাত্রী লইয়া চলিয়াছে সুন্দর দুর্দ্দম ভাসমান লৌহ যান।

অস্পষ্ট দাপদাপি ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। আর কয়েক মিনিট!

অনু”

“কী?”

“নমিতাকে তুই চিনতে পারবি?”

অণিমা তার বড়মার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে জিজ্ঞাসু চোখে।

“সে কি! তুই কি কিছু জানিস না?—নমিতাও যে এই ষ্টীমারেই কলকাতা যাচ্ছে আজ।”

“কে বললে?”

এই তো চিঠি, এতেই লেখা আছে।”

অণিমার বুকটা একবার দুলিয়া ওঠে। বাদলদা কেবল ভীরুই নয় সে শঠ, সে মিথ্যাবাদী! কথাটা তার কাছ হইতে লুকাইবার কি প্রয়োজন ছিল?

দেখিতে দেখিতে ষ্টীমার বকুলতলার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে অসহ্য আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া, উৎক্ষিপ্ত ফেনায় ফেনায় সম্মুখের অবাধ বিস্তার কাটিয়া, স্পর্দ্ধিত যন্ত্রশক্তি রুষিয়া ফুঁসিয়া ভাসিয়া ছুটিয়া আসে—পেছনে রাখিয়া যায় ভাঙ্গনের খেলা।—প্রচণ্ড বেগে ঢেউ-এর পর ঢেউ আসিয়া কূলে কূলে আছাড় খাইয়া পড়ে। এই অনিবার্য্য গতি রোধ করিবে সাধ্য কার!

ষ্টীমার এবার বকুলতলার মুখোমুখী। মন্দাকিনীর বুকে কে যেন ঢেঁকির পাড় দিতে থাকে। অনিমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে নিশ্চল পাথরের মূর্তিরমত।

নীলু আর বাবলু প্রায় এক সঙ্গেই চীৎকার করিয়া ওঠে, "মা ঐ দ্যাখো দাদা—দোতালায়, ঐ যে।"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে চাহিয়া আছে মন্দাকিনী ও অনিমা। বকুলতলার দু'জোড়া সজল চোখ দেখিতেছিল সুধীরের পাশে রেলিঙে ভর দিয়া যে আর একজন দাঁড়াইয়া আছে সেই মেয়েটিকেও।—যে মেয়েটি এই সাতদিন বকুলতলা হইতে বহু দূরে থাকিয়াও দুইটি পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে প্রভাব বিস্তার কম করে নাই।—চশমা পরা একটি কৃশাঙ্গী তরুণী; অনিমার চেয়েও লম্বা, মন্দাকিনীর চেয়েও কালো। দূর হইতে আর কিছু বোঝা যায় না—আর কিছু ধরা যায় না। এই নমিতা! কলিকাতা!

বাবলু প্রাণপণে রুমাল দেখাইতেছে। নীলুরও আঁচল উড়িতে থামে নাই। ষ্টীমার কিন্তু অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। সুধীরকে আর স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না। বকুলতলা পিছনে পড়িয়া থাকে।

মন্দাকিনীর জলভরা চোখের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হইল আর একজোড়া ছল-ছল ডাগর চোখের এদিকে। আর এক দফা প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া গর্জিয়া লাফাইয়া ওঠে বকুলতলার ভাঙনধরা কূলে কূলে।

—শেষ